মার্ক টোয়েনের

পুড্‌নহেড উইলসন

রূপান্তর: শেখ আবদুল হাকিম

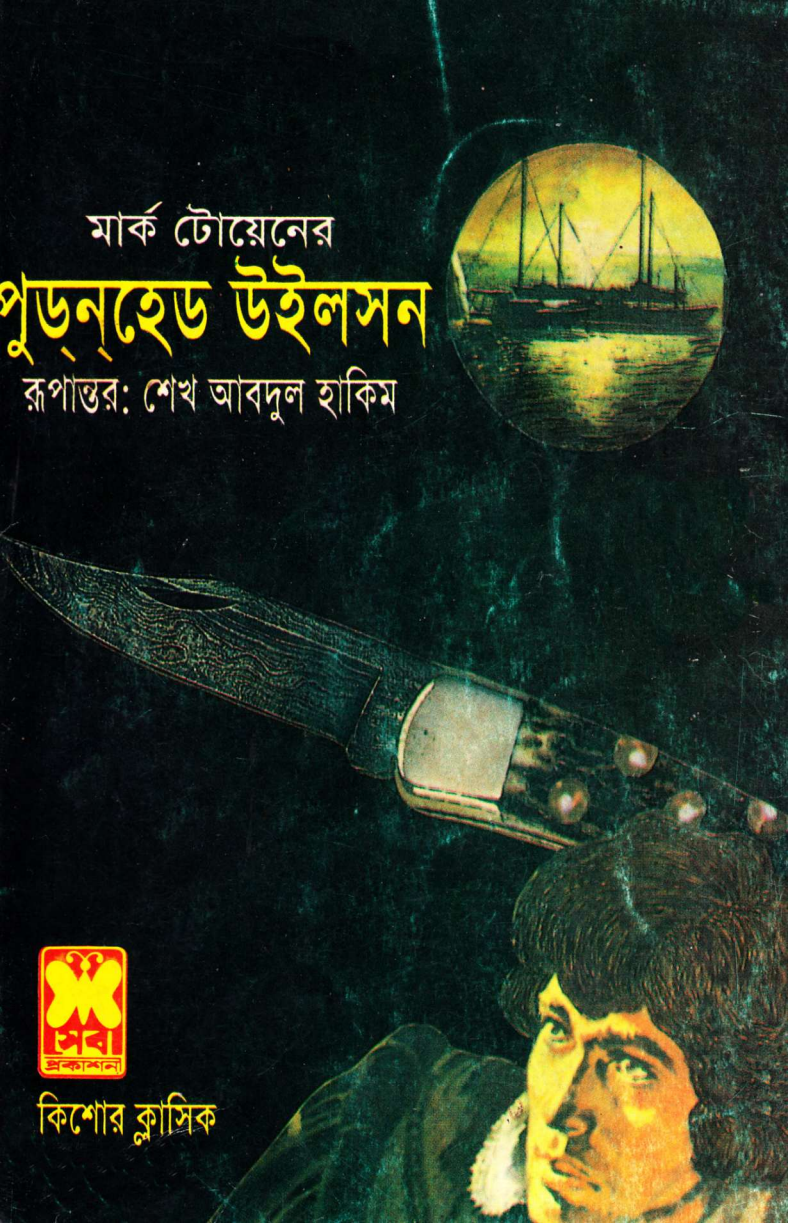

সেবা প্রকাশনী

কিশোর ক্লাসিক

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

কিশোর ক্লাসিক

মার্ক টোয়েন-এর

পুড্‌ন্‌হেড উইলসন

রূপান্তর: শেখ আবদুল হাকিম

সেবা প্রকাশনী

এক

যুক্তরাষ্ট্রে মিসিসিপিকে বড় নদী বলেই ডাকা হয়। আঠারোশো ত্রিশ সালের কথা, এই বড় নদীর তীরে সবেমাত্র গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটা নতুন শহর। এই রকম এক শহরের নাম ডসন ল্যান্ডিং।

এ-সব শহরের পত্তন হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদেই। ব্যবসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহরও বড় হয়। ধুম জমি কেনা-বেচা চলছে, রিয়্যাল এস্টেট ব্যবসায়ীদের দম ফেলবার ফুরসত নেই। প্রথমে মাথা ঘামানো, পরে টাকা খাটানো। মাথা খাটিয়ে বুঝে নিতে হয় আগামী কয়েক বছরে কোনদিকে কতটা বড় হবে শহর। সেই মত যত বেশি সম্ভব জমি কেনা। আজ যে জমি পানির দরে পাওয়া যাচ্ছে, কদিন পর সেটাই আগুন হয়ে উঠবে। তবে আন্দাজ ঠিক হওয়া চাই, তা না হলে ব্যবসায়ী ডুববে।

পার্সি ড্রিস্কল একবারও ডোবেননি। তাঁর শুধু আন্দাজ নির্ভুল নয়, বৃহস্পতিও তুঙ্গে, মুঠোয় ধুলো তুললেও তা সোনা হয়ে যাচ্ছে। সময়টা যে তাঁর খুব ভাল যাচ্ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দু'হাতে টাকা তো কামাচ্ছেনই, সম্প্রতি পারিবারিক

আভিজাত্যও অর্জিত হয়েছে। এই আভিজাত্য অবশ্য বড় ভাই ইয়র্ক দ্রিস্কলের অবদান। ইয়র্ক দ্রিস্কল জজ হয়েছেন। একজন জজের ভাই, কাজেই পার্সি দ্রিস্কলকেও লোকে শ্রদ্ধা-সম্মান করে। জমির যারা খদ্দের, প্রথমে তারা পার্সির কাছেই আসে।

কিন্তু তারপরও পার্সি দ্রিস্কলের মনে শান্তি নেই। এত কামাচ্ছেন, অথচ সব বৃথা মনে হয়। কারণ তাঁর ছেলেপুলে নেই। পরপর তিনটে ছেলে হয়েছিল, হয়েই মারা গেছে। তাঁর স্ত্রী আবার মা হতে যাচ্ছেন, কিন্তু এবারের অবস্থা আরও বিপজ্জনক। ডাক্তার সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, মিসেস পার্সির এমন সব শারীরিক জটিলতা দেখা দিয়েছে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তিনিই বাঁচেন কিনা সন্দেহ।

চিকিৎসায় কোন রকম গাফলতি করা হচ্ছে না, ওষুধ আর পথ্যের পিছনে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত খরচ করছেন পার্সি দ্রিস্কল। আত্মীয়-স্বজনরা এসে সাহস যোগাচ্ছেন। বড় ভাই, জজ সাহেব, সারাক্ষণ প্রার্থনা করছেন—ঈশ্বর, এই বিপদ থেকে পার্সিকে তুমি রক্ষা করো।

পার্সি দ্রিস্কল যখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় প্রায় দিশেহারা, ঠিক এই সময় শহরে হাজির হলো এক আগন্তুক। পেশায় তিনি উকিল, নাম ডেভিড উইলসন। ডসন ল্যান্ডিঙে দু'চারজন উকিল আগে থেকেই আছে, একজন দু'জন করে আরও আসছে। দেশের সবচেয়ে বড় শহর নিউ ইয়র্কে ওকালতি শুরু করেছিলেন উইলসন, কিন্তু সেখানে সুবিধে করতে না পেরে একেবারে ছোট শহর ডসন ল্যান্ডিঙে চলে এসেছেন। এখানে উকিলের সংখ্যা

এখনও কম, ব্যবসা জমাবার আশা আছে।

স্টীমার থেকে নামছেন উইলসন। বন্দরে যত অলস আর বেকারদের আড্ডা। কোন স্টীমার যখন আসে বা যায়, আরোহীর চেয়ে দর্শকের সংখ্যা দাঁড়ায় চারগুণ। উইলসনকে স্টীমার থেকে নামতে দেখে এক বুড়ো আন্দাজ করল, নতুন আমদানি। 'কিছু যদি মনে না করেন, কোত্থেকে আসা হলো?'

ওকালতি ব্যবসায় জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বড় পুঁজি। অমায়িক হেসে উইলসন বললেন, 'আসছি তো নিউ ইয়র্ক থেকেই।'

'ঘেউ-ঘেউ, ঘেউ।' পাশ থেকে একটা কুকুর ডাকছে। বেওয়ারিশ কুকুর ধরার ব্যাপারে ডসন ল্যান্ডিঙের পৌরসভা বিশেষ মনোযোগী নয়।

'নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে, ডসন ল্যান্ডিঙে? কি ব্যাপার, জমি কিনবেন নাকি?' এ-প্রশ্ন সেই বুড়োর নয়, আরেক লোকের। বুড়োর ছিল দাড়ি, আধ-বুড়োর রয়েছে গোঁফ।

'জমি হয়তো কিনব, তবে তার আগে ওকালতিটা জমিয়ে নিতে চাই।'

'ঘেউ-ঘেউ।'

'ও, আচ্ছা, ওকালতি করবেন। ভাল জায়গাতেই এসেছেন, এখানে উকিল তো মাত্র হাতেগোনা কয়েকজন,' এ মন্তব্য ঢোলা পোশাক পরা এক যুবকের, চেহারায় বিষাদ আর উদাস একটা ভাব।

'উকিলের সংখ্যা কম বা বেশি, সেটা কোন ব্যাপার নয়,' একটু গর্বের সঙ্গেই বললেন উইলসন। 'কঠিন প্যাঁচ আছে এমন

একটা মামলা যদি পাই, যে মামলায় বুদ্ধির খেলা দেখাবার সুযোগ আছে...'

'ঘেউ-ঘেউ, ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ...'

কথা শেষ করতে পারলেন না উইলসন, ঘাড় ফিরিয়ে সারমেয়টির দিকে তাকালেন। খানিকটা বিরক্তি, খানিকটা কৌতুক ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়। নতুন জায়গা, এখানে তাঁর পরিচয় ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন আছে, সে-কথা ভেবেই একটু রসিকতা করার সুযোগ হাতছাড়া করতে মন চাইল না। বললেন, 'এই কুকুরের অর্ধেকটা আমার হলে কি করতাম আমিই জানি।'

'অর্ধেক?' বুড়ো, আধবুড়ো এবং তরুণটি একযোগে সবিস্ময়ে জানতে চাইল। 'অর্ধেক দিয়ে কি হবে?'

'সেই অর্ধেকটাকেই ফাঁসিতে ঝোলাতাম!' বেড়ে একটা রসিকতা করা গেছে, এরকম একটা ভঙ্গি করে হেলেদুলে পা বাড়ালেন উইলসন। তাঁর পিছনে কুকুরটা অনবরত ঘেউ ঘেউ করছে।

পিছন থেকে ওরা তিনজন উইলসনের পিঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েই আছে। মুখে বিরক্তির ছাপ, চোখের দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য। উইলসনের কপাল মন্দ, অপাত্রে দান হয়ে গেছে। তার রসিকতা ওরা কেউ বোঝেনি।

বুড়ো বলল, 'অর্ধেক কুকুর? বলে কি লোকটা! কুকুরের অর্ধেকটা!'

আধ-বুড়ো প্রশ্ন করল, 'অর্ধেককে ফাঁসি দিলে বাকি অর্ধেক কি বাঁচবে?'

নিজের মাথায় চাটি মেরে যুবক বলল, 'উকিল ব্যাটা স্রেফ একটা গর্দভ। ওর মাথাটা গোবরের ডিপো।'

এ খুব রহস্যই বটে যে এক একটা এমন কথা মানুষের মুখ থেকে বেরোয়, কিভাবে যেন গোটা এলাকায় তা ছড়িয়ে পড়ে। ডসন ল্যান্ডিঙে সদ্য আসা উকিল উইলসন সম্পর্কে বাউণ্ডুলে যুবকের মন্তব্যটিও কি এক রহস্যময় কারণে গোটা শহরে প্রচার হয়ে গেল। তার ফলে কি ঘটল? কিছুদিন পরই দেখা গেল উইলসনকে রাস্তায় দেখলেই একদল বাচ্চা ছেলে তাঁর পিছু নিচ্ছে, হাততালি দিয়ে ছড়া কাটছে–

'মাথায় এক ছটাক ঘি নাই
উইলসন একটা যাচ্ছেতাই।'

তারপর এক সময় তাঁর নামটা বিকৃত হয়ে গেল। সবাই তাকে 'গুবরে উইলসন' বলে ডাকে।

ভাড়া নেয়া বাড়িতে সাইনবোর্ড টাঙালেন তিনি– 'ডেভিড উইলসন, অ্যাডভোকেট'। দিন কয়েক পরই তাঁর চোখ কপালে উঠল। রাতে কে যেন ডেভিড শব্দটি মুছে তার জায়গায় লিখেছে 'গুবরে'। অগত্যা বাধ্য হয়েই সাইনবোর্ড নামিয়ে ফেলতে হলো।

মাসের পর মাস পার হয়ে যাচ্ছে, অথচ একটাও মক্কেল জুটছে না। কিন্তু তাই বলে হতাশ হবার পাত্র নন উইলসন। ওকালতি করা সম্ভব হচ্ছে না, অন্য কাজ করতে অসুবিধে কি? তাঁর আরও অন্তত দুটো কাজ জানা আছে। এক, তিনি হাত দেখতে পারেন। দুই, আঙুলের ছাপ নিতে জানেন। লোকজনের হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলে দেন। যখন তখন যার তার আঙুলের

ছাপও সংগ্রহ করেন।

ওদিকে পার্সি ড্রিস্কলের পরিবারে ঘটল এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তাঁর বাড়িতে একই দিনে জন্ম হলো দুটি শিশুর। একটি মিসেস পার্সির, অন্যটি তাদের ক্রীতদাসী রক্সির।

দুঃসংবাদ হলো, ডাক্তারের কথা ফলতে শুরু করেছে। সন্তান প্রসবের পর জ্ঞান হারালেন মিসেস পার্সি, অনেক চেষ্টার পর যদি বা জ্ঞান ফিরিয়ে আনা গেল, সুস্থ হয়ে ওঠার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। বিছানায় তিনি লাশের মতই পড়ে আছেন, নড়াচড়ার শক্তিও যেন অবশিষ্ট নেই। কোলের শিশুকে দেখাশোনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

বাড়িতে ক্রীতদাস তিনজন হলেও, ক্রীতদাসী বলতে রক্সি একাই। গৃহকর্ত্রীর শুশ্রূষা করবে ক্রীতদাসরা, এ তো আর হয় না। অথচ একমাত্র ক্রীতদাসী রক্সিও তো সবেমাত্র সন্তানের মা হয়েছে।

তবে মা হয়েছে তো কি, দাসীদের অসুস্থ বা ক্লান্ত হতে নেই। সারাদিন খাটাখাটনির মধ্যে থাকে বলে শরীরটাও তাদের লোহার মত হয়ে যায়। 'পারব না', এই কথাটা তারা কখনও বলে না, বলবার অধিকারও তাদেরকে দেয়া হয়নি। কাজেই মনিব যখন ডেকে পাঠালেন, হাসিমুখেই নিজের বিছানা ছেড়ে গৃহকর্ত্রীর বিছানার পাশে হাজির হলো রক্সি। যদিও সে নিজে এখনও অসুস্থ, তবু তার ওপর আদেশ হলো—দুটি শিশু ও একটি রোগিনীকে তার দেখতে হবে। সে আদেশ খুশিমনেই মাথায় তুলে নিল রক্সি।

গৃহকর্ত্রীর অসুস্থতা দিনে দিনে বাড়ছে। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর সময় শেষ হয়ে এসেছে। তাই একদিন রক্সির হাত ধরে কাতর কণ্ঠে বললেন, 'আমার টমকে আমি তোমার হাতেই তুলে দিয়ে যাচ্ছি, রক্সি। তুমি আমাকে কথা দাও, আমার ছেলের যেন কোন কষ্ট না হয়।'

রক্সি বলল, 'যীশু আর মেরির কিরে, মা। কথা দিলাম, আপনার ছেলেকে আমি নিজের ছেলের চেয়েও বেশি আদর-যত্নে মানুষ করব। আমার ছেলে চেম্বার জন্মেইছে তো ওর দাস হয়ে, চিরকাল দাস হয়েই বেঁচে থাকবে সে।'

রক্সি নিজের ছেলের নাম রেখেছে চেম্বার। তার নিজের গায়ের রঙ ঠিক কালো নয়, কারণ সে আসলে পুরোপুরি নিগ্রো নয়, দোআঁশলা। কিন্তু কি কারণে কে জানে ছেলেটা হয়েছে একেবারে ধবধবে সাদা, যাকে বলে একেবারে সাহেব বাচ্চা।

গৃহকর্ত্রী সত্যি সত্যি একদিন মারা গেলেন। স্ত্রীর স্মৃতি ভুলে থাকার জন্যে আরও বেশি করে ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়লেন পার্সি ড্রিস্কল। ছেলে টমের কথা তিনি ভুলে যাননি, রক্সিকে ডেকে স্ত্রীর বলে যাওয়া কথাটাই আরেক বার মনে করিয়ে দিলেন। 'আমার টমের যেন কোন কষ্ট না হয়, রক্সি। তোমার একটাই কাজ, টমের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখা। বুঝতেই তো পারছ, ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতে হয় আমাকে যে ওর দিকে খেয়াল দেয়ার সময় পাই না।'

রক্সি আবারও কিরে-কসম খেয়ে জানাল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার। আমি বেঁচে থাকতে আপনার টমের কোন কষ্ট হবে

না।'

রক্সির সুবিধের কথা ভেবে একই ঘরে দুটো খাট ফেলা হলো। একটা খাট হাতির দাঁতের কাজ করা আবলুস কাঠ দিয়ে তৈরি, তাতে দেড় ফুট পুরু গদির ওপর মখমল ঢাকা বিছানা; সেই বিছানায় শুয়ে থাকে পার্সি দ্রিস্কলের আদরের দুলাল, একমাত্র বংশধর টম দ্রিস্কল। সস্তা কাঠ জোড়াতালি দিয়ে বানানো হয়েছে আরেকটা খাট, সেই খাটের শক্ত বিছানায় অবহেলায় পড়ে থাকে বংশপরিচয়হীন চেম্বার।

সবাই রক্সির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। টম টম করে জান দিচ্ছে সে। দিনে রাতে সারাক্ষণ টমের যত্ন নিতেই ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় তাকে। আর চেম্বার, তার নিজের ছেলে? খিদে পেলে চেম্বারকে গলা ছেড়ে কাঁদতে হয় বেশ কিছুক্ষণ, তারপর যদি মা এসে খাওয়ায়। ছেলের কান্না শুনে বাড়ির সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে গজগজ করতে থাকে রক্সি, 'যেমন রক্তে জন্ম, স্বভাবটাও তো ঠিক তেমনি হবে! দেখো না, কোন কারণ ছাড়াই কেমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে! আর আমার সোনার টুকরো, চোখের মণি টমকে দেখো! কেমন ভদ্র আর শান্তটি হয়ে ঘুমাচ্ছে! হবে না, কোন বংশের ছেলে দেখতে হবে তো!'

কিন্তু রাত যখন গভীর হয়, বাড়ির সবাই যখন যে-যার ঘরে অঘোরে ঘুমায়, তখন যাকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করে রক্সি, সে টম নয়; সে তার নিজের সন্তান চেম্বার।

হ্যাঁ, ছলনা তো বটেই। কিন্তু একজন ক্রীতদাসী ছলনা করবে না তো কে করবে? এই পৃথিবী কি তার সঙ্গে ছলনা করছে না?

নিজের বলে কিছুই তার নেই, পোষা গরু-ঘোড়ার চেয়েও কম স্বাধীনতা দেয়া হয় তাকে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই ছল করতে শিখছে সে। সুযোগ পেলে সমাজবিরোধী কাজে নাম লিখিয়ে খলনায়িকাও হয়ে উঠতে পারে।

দোতলায় শিশুদের সেই ঘরে বসেই রক্সি একদিন ছড়াটা শুনতে পেল–

'মাথায় এক ছটাক ঘি নাই
উইলসনটা যাচ্ছেতাই!'

পাড়ার ছেলেরা দলবেঁধে হাততালি দিচ্ছে আর ছড়া কাটছে, উকিল উইলসন হাসি মুখে নিজের পথে হেঁটে যাচ্ছেন। আইন ব্যবসার কথা আপাতত ভুলে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করছেন তিনি। ধনী বা গরীব, শিশু বা বুড়ো, কাউকে তিনি বাদ দেন না–একে একে সবারই হাতের ছাপ নেন, তাও একবার করে নয়, কয়েকবার করে। ছাপগুলো তিনি নিজের ঘরে সযত্নে সাজিয়ে রাখেন। ঘরটাকে এখন আর কেউ অফিস কামরা বলে চিনতে পারবে না। সেটা যেন কোন নামকরা গোয়েন্দা বা অপরাধ-বিজ্ঞানীর রেকর্ড-রুম। দেয়ালে, শেলফে, ডেস্কে, শো-কেসে শুধু ছাপ আর ছাপ।

কার খেয়েদেয়ে কাজ নেই উইলসনের অফিসে হাতের ছাপ দিতে আসবে। উইলসন সেটা আশাও করেন না। তিনি নিজেই সবার দরজায় হাজির হন। এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া, সারাক্ষণ তিনি ছুটছেন। তাঁর কোন ক্লান্তি নেই। ক্লান্তি নেই পাড়ার ছেলেগুলোরও। তারা তাকে দেখলেই হৈ-চৈ করে ওঠে। উইলসন

অবশ্য প্রতিবাদ করেন না। প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা, ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসেন তিনি।

তার ফলও খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া গেল। যে মানুষ এত নরম, যার এত সহ্যগুণ, তাকে লোকে ভাল না বেসে পারে? ছড়াটা যে ভাবই প্রকাশ করুক, উইলসনের জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছে। শহরের লোকজন এখন তাঁকে সত্যি খুব পছন্দ করে। লোকে এখনও তাকে 'গুবরে' বলে ডাকলেও, সেটা আসলে আদর করে ডাকা।

তারপর একদিন দেখা গেল রক্সির সেই দোতলা কামরায় উঠে এসেছেন উইলসন। 'তোমার আর বাচ্চাদের ছাপ নেব, রক্সি।'

'কি যে বলেন না, মি. উইলসন! কেনা বাঁদী আর তার ছেলের কি-ই বা দাম যে তাদের হাতের ছাপ নিতে হবে! তবে, হ্যাঁ, টম সাহেবের ছাপ অবশ্যই আপনাকে নিতে বলব। দু'দিন বাদেই তো আমাদের টম ডসন ল্যান্ডিঙের গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠবেন।'

'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ছোট বড় ভেদ নেই, রক্সি। টম আর চেম্বার, দু'জনের ছাপই আমি নেব। কিন্তু রক্সি, একটা ব্যাপার তো দেখছি ভারি অদ্ভুত! বাচ্চা দুটো দেখতে হুবহু প্রায় একই রকম হলো কি করে? পোশাক দু'রকম না হলে কোনটা যে কে আমি তো চিনতেই পারতাম না।'

মুখ টিপে হাসল রক্সি, সে হাসিতে কি যেন একটা রহস্য আছে। তারপর বলল, 'আপনার চোখে দেখছি কিছুই এড়ায় না। ঠিকই ধরেছেন, মি. উইলসন। কি করে জানি না দু'জনের চেহারা

একরকম হয়ে গেছে। ওদেরকে গোসল করাবার সময় কোনটা যে কে তা আমার মনিবও চিনতে পারেন না–মানে, ওদের গায়ে যখন কাপড় থাকে না আর কি।'

হেসে উঠে উইলসন বললেন, 'তুমি চিনতে পারলেই যথেষ্ট। তুমিই যখন ওদেরকে মানুষ করছ।' গল্প-গুজবে সময় নষ্ট করা স্বভাব নয় তাঁর, মুখের সঙ্গে হাতও চলছে। বাচ্চা দুটোর ছাপ নেয়া হয়ে গেল। একটা ছবির নিচে লিখলেন– 'টম ড্রিস্কল, পার্সি ড্রিস্কলের ছেলে।' অপরটির নিচে– 'রক্সির ছেলে চেম্বার'। এবার রক্সির ছাপ নিতে হবে।

রক্সি জানতে চাইল, 'আচ্ছা, মি. উইলসন, কথাটা কি সত্যি–কারও হাতের ছাপ অন্য কারও সঙ্গে মেলে না?'

'অবশ্যই সত্যি। সেজন্যেই তো এত কষ্ট করে সবার ছাপ নিয়ে বেড়াচ্ছি। ভবিষ্যতে এই ছাপ হাজার রকম কাজে লাগবে। হয়তো আমার এই সংগ্রহই সাহায্য করবে চোর-ডাকাত ধরতে।'

পার্সি ড্রিস্কলের বাড়িতে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল। ভদ্রলোকের কিছু টাকা চুরি গেছে। তিনি তো রেগে একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। অবশ্য এর আগেও এ-বাড়িতে চুরি হয়েছে, তবে এবারের টাকার পরিমাণ অনেক বেশি। এর আগে যতবারই চুরি হয়েছে, তেমন গুরুত্ব দেননি পার্সি, শুধু কঠিন ভাষায় দাস-দাসীদের সাবধান করে দিয়েছেন। শেষবার হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, 'এরপর কিন্তু আর ক্ষমা করা হবে না। ফের যদি কিছু চুরি হয়, তোমাদের সব ক'টাকে ভাটিতে বিক্রি করে দিতে বাধ্য

হব।'

'ভাটিতে বিক্রি' করা হবে শুনলেই এলাকার দাস-দাসীরা আঁতকে ওঠে। মিসিসিপির দক্ষিণ অংশটাকে ভাটি বলা হয়। সেখানে কেনা দাস-দাসীদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। ভাটি অঞ্চলে তুলোর চাষ হয়, দাস-দাসীদের কাজ করতে হয় ওই তুলোর খেতে। প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ, তার ওপর কাজে একটু ঢিল পড়লে ভাগ্যে জোটে নির্মম চাবুক। শোনা যায়, সেই চাবুকের বাড়ি খেয়ে অনেকেই বাঁচে না।

ক্রীতদাস তিনজন ভেবেছিল, দ্রিস্কল মুখে যাই বলুন, তাঁর মত দয়াল মনিব কোনদিনই তাদেরকে ভাটিতে বিক্রি করবেন না। বিশেষ করে রক্সি যখন তাদের সঙ্গে রয়েছে। চোর সন্দেহে তাদেরকে যদি বিক্রি করতেই হয়, রক্সিকেও বেচতে হবে। তাহলে টমকে কে দেখবে?

কিন্তু ওদের ভাবনাকে ওলটপালট করে দিয়ে দ্রিস্কল বললেন, 'এ আর আমি সহ্য করব না। চোর পুষতে আমি রাজি নই। সত্যি সত্যি সব ক'টাকে ভাটিতে বেচে দিচ্ছি।'

ভয়ে কেঁদে ফেলল ওরা। সবাই তার পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। চুরির কথা স্বীকার গেল, মাফ চাইল, কথা দিল আর কখনও এমন কাজ করবে না। কিন্তু দ্রিস্কল এবার অনড়। আগে তিনি অনেকবারই ক্ষমা করেছেন, কিন্তু এরা সাবধান হয়নি। এদের স্বভাব আসলে কোনদিনই বদলাবে না। নিজের কথায় অটল থেকে তিনজন ক্রীতদাসকেই বিক্রি করে দিলেন তিনি। তবে দয়া দেখিয়ে ভাটিতে নয়, কাছাকাছি এলাকায় বিক্রি করলেন। কিন্তু

রক্সি কে? রক্সিকে এই শেষবারের মত ক্ষমা করলেন ড্রিস্কল। ক্ষমা করলেন টমের কথা ভেবে। তবে কঠিন ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন, এরপর তার কোন অপরাধই ক্ষমা করা হবে না।

মস্ত একটা ফাঁড়া থেকে রক্সি বেঁচে গেল ঠিকই, কিন্তু একটা আতঙ্ক তাকে পেয়ে বসল। ড্রিস্কল জানিয়ে দিয়েছেন, তার আর কোন অপরাধ ক্ষমা করা হবে না। কিন্তু এমন ক্রীতদাসী দুনিয়ার কোথাও আছে কি যে কখনও কোন অপরাধ করবে না? মানুষের স্বভাবের মধ্যেই তো অপরাধ করার বীজ লুকিয়ে আছে। তাছাড়া, মনিব ভুল করেও তো তাকে অপরাধী ভাবতে পারেন! সেক্ষেত্রে শাস্তির হাত থেকে কে তাকে বাঁচাবে?

আরেকটা কথা ভাবতেই সারা শরীর ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল রক্সির। মনিব যদি তাকে বেচে দেন, তার সঙ্গে চেম্বারকেও নিশ্চয় বেচে দেবেন। ছেলে তার কলজের টুকরো, কোন পিশাচের হাতে গিয়ে পড়বে কে জানে! ক্রীতদাসীর সন্তান হয়েও এ-বাড়িতে দুধ-ক্ষীর খেয়ে মানুষ হচ্ছে চেম্বার। অন্য লোকের হাতে পড়লে লাথি-ঝাঁটা খেতে খেতে তার ছেলে মরে যাবে। না, সে ঝুঁকি রক্সি নিতে পারে না। যেভাবেই হোক, এর একটা সমাধান বের করতে হবে তাকে। চেম্বারের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক ও নিরাপদ না করা পর্যন্ত তার মনে শান্তি আসবে না।

চিন্তা করতে করতে হঠাৎ চমকে উঠল রক্সি। তার মাথায় দুঃসাহসিক এক পরিকল্পনা খেলছে। ধারণাটা এতই ভয়ঙ্কর, নিজেই সে ভয় পেয়ে গেল। উত্তেজিত রক্সি অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করল। এক সময় বিড়বিড় করে নিজেকেই শোনাল, 'এ তো

হওয়ালেই হয়। কঠিন, তবে সম্ভব। আমি পারব।'

আসল কথা হলো, বুকের ধন চেম্বারকে তার বাঁচাতে হবে। এমন একটা নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কেউ কোনদিন তাকে বিক্রি করার কথা ভাবতেও না পারে। সে ব্যবস্থা কি, রক্সি জানে।

রাত গভীর হতে দুই শিশুর গায়ের কাপড় খুলে ফেলল রক্সি। আবার সেগুলো পরাল, তবে টমকে পরাল চেম্বারের সস্তা কাপড়, আর চেম্বারের গায়ে তুলল টমের দামী পোশাক। তারপর?

তারপর টমের দামী খাটে চেম্বারকে শোয়াল রক্সি।

আর চেম্বারের ভাঙাচোরা চৌকিতে ঠাঁই পেল কোটিপতির বংশধর টম দ্রিস্কল।

দুই

কেউ কিছু টের পেল না, ধরা পড়ার ভয়টা ধীরে ধীরে কেটে গেল রক্সির। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। ক্রীতদাসীর ছেলে চেম্বার মানুষ হচ্ছে কোটিপতি দ্রিস্কলের সন্তান হিসেবে, আর দ্রিস্কলের পুত্রধন অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকছে বাঁদী-দাসীদের মহলে।

সমবয়েসী বাচ্চা, একই বাড়িতে বড় হচ্ছে, স্বভাবতই

একসঙ্গে ঘোরাফেরা আর খেলাধুলো করে। মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে যতদিন না তারা সচেতন হলো, ততদিন তাদের মেলামেশায় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হলো না। ছয়-সাত বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত সরল ও নিরীহ ভাবটা দু'জনের মধ্যেই বজায় থাকল। কিন্তু তারপরই টমের আচরণে অহমিকা আর দম্ভ প্রকাশ পেতে শুরু করল। টম মানে এখানে মেকি টম, ময়ূর সাজা কাকের ছা।

খেলতে বসে জেদ ধরে মেকি-টম, অন্যায় আবদার করে। খেলায় সে হারতে রাজি নয়, হেরেও বলবে জিতেছে। মেকি-চেম্বার মাঝে মধ্যে অন্যায় দাবি মানতে চায় না, তখন মেকি-টম প্রচণ্ড রেগে যায়। আর রাগ হলেই হাত চালায় মেকি-টম, মেকি-চেম্বারের মুখে দুম দুম কিল আর ঘুসি পড়তে থাকে।

টমকে খানিক পরপরই কোলে টেনে নিয়ে মিঠাই-মণ্ডা খাওয়ায় রক্সি। দেখে সবাই বলাবলি করে, 'দেখ, দেখ! আদর্শ ক্রীতদাসীর দায়িত্ববোধ কাকে বলে দেখ! সারাক্ষণ শুধু মনিবের ছেলেকে ভাল-মন্দ খাওয়াচ্ছে, নিজের ছেলে কি খাচ্ছে না খাচ্ছে ফিরেও দেখে না।'

আসল ঘটনা তো আর কেউ জনে না! অন্যায় বৈষম্য বিভ্রান্ত করে সবাইকে। রক্সির আচরণে পার্সি ড্রিস্কল মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। দাস-দাসীরা হতভম্ব। একজন ক্রীতদাসী এতটা মহৎ হতে পারে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, তবু বিশ্বাস করতে হয়। চোখ তো আর ভুল দেখছে না!

তবে প্রকৃতির মার বলেও একটা কথা আছে। বেশি বেশি মিষ্টি খাওয়ানোয় মেকি-টমের পেটের অসুখ স্থায়ী হয়ে গেল।

দিনে দিনে রোগা আর দুর্বল হচ্ছে সে।

আর মেকি-চেম্বার? ভুসি মেশানো মোটা রুটি, খোলাসুদ্ধ আলু আর আধসিদ্ধ ংস খেয়ে বড় হচ্ছে সে, দিনে দিনে শরীর-স্বাস্থ্য ফেটে পড়ছে তার। গায়ে যেমন জোর, মনেও তেমনি ফুর্তি। ঝগড়া-মারামারির সময় তার মনে থাকে না যে টম মনিবের ছেলে, সে তাদের ক্রীতদাস। টম একটা কিল মারলে, বদলা হিসেবে তিনটে কিল মারে সে। মার খেয়ে কাঁদতে থাকে টম, চেম্বারকে শাসন করার জন্যে ছুটে আসে রক্সি। ছুটে আসে ঠিকই, কিন্তু শাসন করতে পারে না, কোথায় যেন বাধে। এমন কি চেম্বারের চোখে চোখ রেখে কথা বলতেও দ্বিধায় ভোগে সে। তখন সম্ভবত তার মনে পড়ে যায় গৃহকর্ত্রীর সেই অন্তিম অনুরোধটি, 'রক্সি, আমার ছেলের যেন কোন কষ্ট না হয়। তুমি আমাকে কথা দাও!'

টম মার খাচ্ছে দেখেও চেম্বারকে রক্সি শাসন করতে পারে না। টম অন্যায় করলেই নির্ভয়ে তাকে উত্তম-মধ্যম দেয় চেম্বার। এটাই একদিন রক্সির জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াল। সেদিন দু'জন মারামারি ছুটোছুটি করতে করতে এমন এক জায়গায় এসে পড়ল যেখানে চেয়ারে বসে রোদ পোহাচ্ছিলেন পার্সি দ্রিস্কল। তাঁকে দেখেই চিৎকার দিল টম, 'বাবা, দেখো! চেম্বার আমাকে শুধু শুধু মারছে!'

পার্সি দ্রিস্কলের মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। এত সাহস চেম্বারের? একজন ক্রীতদাস-পুত্রের? প্রভুর সন্তানকে সে মারে? দ্রিস্কলের মনে হলো, দুনিয়াটা উল্টো দিকে ঘুরছে। এত বড় স্পর্ধার বিচার

না করলে দাসপ্রথাই যে ভেঙে পড়বে। চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন তিনি, খপ করে ধরে ফেললেন চেম্বারকে। কাছেই পড়েছিল গাছের মোটা একটা ডাল, সেটা চেম্বারের পিঠে ভাঙলেন তিনি। পাশে দাঁড়িয়ে সেই নির্মম দৃশ্য দেখল টম, উল্লাসে চোখ দুটো তার চকচক করছে।

মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন দ্রিস্কল। চেম্বারকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা, ভাগ! এখন থেকে নিজের ওজন বুঝে চলবি!'

রক্সি আড়াল থেকে হাসল।

তবে সেই থেকে চেম্বার তার নিজের ওজন বুঝেই চলতে শিখল। এখনও তাকে টম মারধর করে, কিন্তু বদলা নেয়ার জন্যে মারা তো দূরের কথা, সে এমন কি আত্মরক্ষার চেষ্টাও করে না। প্রভুভক্ত কুকুরের মত টমের পিছু পিছু ঘোরে সে, তার প্রতিটি হুকুম সঙ্গে সঙ্গে পালন করে, শত অত্যাচারেও মুখ খোলে না।

অথচ তাতেও সন্তুষ্ট নয় টম। দাসীর গর্ভে তার জন্ম, পিতার কোন পরিচয় নেই, জন্মেছেই নীচ স্বভাব নিয়ে। এতটুকু বয়সেই সে অত্যন্ত স্বার্থপর ও অহঙ্কারী। সত্যকে সে অনায়াসে মিথ্যে বলে চালিয়ে দেয়। অন্যায়কে ন্যায় বলে চালাতে তার কোথাও বাধে না। চেম্বার তার দু'চোখের বিষ, অথচ চেম্বারকে না হলেও তার চলে না।

ওদের বয়স আরও বাড়ল।

এখন প্রতিবেশী ছেলেদের সঙ্গে খেলতে যায় টম। ডাকে তাই তার সঙ্গে চেম্বারকেও যেতে হয়। সমান মর্যাদা নিয়ে সাদা

সাহেব বাচ্চাদের সঙ্গে খেলার অধিকার তাকে দেয়া হয় না, যদিও সাদা সাহেবদের এই সব বাচ্চাদের চেয়ে তার গায়ের ও মনের রঙ অনেক বেশি পরিষ্কার।

টমের দেহরক্ষীর প্রয়োজন হয়। চেম্বারকে সঙ্গে নেয়ার সেটাই আসল কারণ। বদমেজাজী টম এতদিন একা শুধু চেম্বারের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে। ইদানীং, বাইরে খেলতে বেরুবার পর থেকে, সমবয়সী কাউকে দেখলেই তার ভেতর মারমুখো একটা ভাব জেগে ওঠে। হিংস্রতা আর অসহিষ্ণুতা দমিয়ে রাখতে পারে না সে। কিন্তু প্রতিবেশীর ছেলেরা তো আর ক্রীতদাস নয়! তারা টমের অন্যায় অত্যাচার মানবে কেন? টম তাদের মারলে তারাও টমকে দু'চার ঘা বসিয়ে দেয়। তার গায়ে শক্তি কম, মারামারিতে কারও সঙ্গেই জিততে পারে না। আর তখনই গলা ছেড়ে চিৎকার দেয়, 'চেম্বার! চেম্বার! ওদের মার তো!'

প্রভুভুক্ত চেম্বার টমের ডাক পেলেই হয়, একেবারে বাঘের মত ছুটে আসে। চেম্বারের মার খাবার পর কোন ছেলেই আর তার সঙ্গে দ্বিতীয়বার লাগতে সাহস করে না। চেম্বারকে কিছু না বলে টমকে শাসায় তারা, 'আমরাও দেখব, ওই ক্রীতদাস চেম্বার কতদিন তোকে রক্ষা করে! মজা টের পাবি যেদিন তোকে একা পাব!'

টম তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে। ক্রীতদাস তো চিরকালই তার 'ঙ্গে থাকবে, তাই না?

তবে একদিন সত্যি সত্যি টমকে একা পেয়ে গেল ওরা। সুযোগটা ওদেরকে টম নিজের দোষেই পাইয়ে দিল।

খুবই মজার খেলা স্কেটিং। স্কেট হলো কাঠের জুতো, সেগুলো পায়ে দিয়ে ছেলেরা বরফের ওপর দৌড়াদৌড়ি করে খেলে। ওই স্কেট টমের আছে, চেম্বারের নেই। স্কেট পরে খেলে টম। চেম্বারেরও খেলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু টম তার স্কেট একবারের জন্যেও চেম্বারকে দেয় না। চাইবে, সে সাহসও চেম্বারের নেই। তাছাড়া, চাইলেও দেবে না এটা সে বোঝে বলেই হয়তো চায় না। মুখে সে কিছু না বললেও, তার দুঃখের কথা অন্য ছেলেরা তো বোঝে। তারাই চেম্বারের হয়ে টমকে বলে, 'এক-আধবার ওকেও স্কেট জোড়া দে না, ও-ও একটু খেলুক।'

টম রেগে যায়। 'কেনা গোলাম আবার স্কেট খেলবে কি!'

শুনে মাথা নত করে নিঃশ্বাস ফেলে চেম্বার। তখন অন্য ছেলেদের দয়া হয়। তারা নিজেদের স্কেট চেম্বারকে দিতে চায়। তা দেখে আরও রেগে যায় টম। 'না, খবরদার! আমার গোলামকে তোরা স্কেট দিবি, এ আমি হতে দেব না। তাতে যে আমাকে অপমান করা হয়, বুঝিস না? দিতেই যদি হয়, আমি দেব–আমার যখন ইচ্ছে হবে।'

টমের ইচ্ছেও হয় না, চেম্বারেরও স্কেটিং করা হয় না।

তবে মজার আরও অনেক খেলা আছে। লেকে নৌকা ভাষায় ছেলেরা। অনেকেই নৌকা থেকে ডিগবাজি খেয়ে পানিতে ঝাপ দেয়। এই খেলাটা সবাই পারে না। ডিগবাজি খেতে হলে শারীরিক শক্তি থাকা চাই, তার সঙ্গে দরকার কৌশল। চেম্বার শক্তিশালী ও কৌশলী। টম দুর্বল ও আনাড়ি। কাজেই নৌকা নিয়ে সবাই যখন লেকে নামে, মনের সাধ মিটিয়ে ডিগবাজি খায়

চেম্বার। নৌকায় বসে রাগে ফুঁসতে থাকে টম, হিংসায় জ্বলতে থাকে।

সহ্য করতে না পেরে মনে মনে একটা কুমতলব আঁটল টম।

ডিগবাজি খাবার সময় কি সুন্দর কসরত দেখাচ্ছে চেম্বার! উঁচু পাড়ের ধারে খাপ খোলা তলোয়ারের মত সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, লাফ দেয়ার পর বৃত্তাকারে ঘুরে যাচ্ছে শরীর, লেকে মাথা দিয়ে এমন ভাবে পড়ছে যে পানি খুব কমই ছলকাচ্ছে। একটা করে ডিগবাজি খায় চেম্বার, সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের নৌকা থেকে হাততালি দেয় ছেলেরা।

আর ওদিকে রাগে ফুঁসছে টম। চেম্বার তার গোলাম, সবাই সেই গোলামের প্রশংসা করবে? তার প্রশংসা না করে? রাগটা অবশ্য তার চেম্বারের ওপরই বেশি। এটা তো ভয়ানক অন্যায় যে মনিবের সামনে নিজের প্রশংসা গ্রহণ করবে সে। এতটা বাহাদুরি, এতটা কেরামতি না দেখালেই তো পারে! চেম্বারটা বড় বাড় বেড়েছে, সেজন্যে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

কি সাজা দেবে টম তা জানে। হাতের কাছে বৈঠা রয়েছে, চেম্বারের অজান্তে পানিতে ডুবিয়ে দিল সেটা। চেম্বার আবার ডিগবাজি খাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে তার আন্দাজ মত ঠিক জায়গাতেই দাঁড়াল, এখান থেকে লাফ দিলে নৌকা ঘেঁষে পানিতে পড়বে।

লাফ দিল চেম্বার। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বৈঠা টেনে নৌকাটাকে এক হাত এগিয়ে নিল টম। ফল হলো ভয়ঙ্কর। পানিতে যেখানে চেম্বারের মাথা পড়ার কথা সেখানে এখন পানির

বদলে নৌকা রয়েছে। ডিগবাজি খেয়ে ওই নৌকার ডগাতেই মাথা দিয়ে পড়ল চেম্বার।

মাথা ফেটে মগজ বেরিয়ে পড়লেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। কিন্তু নৌকার ডগায় একগাদা দড়িদড়া ছিল, মাথাটা সেগুলোর ওপর পড়ায় আঘাত গুরুতর হলো না। তবে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল চেম্বার।

আশপাশ থেকে আঁতকে উঠল সবাই। তারা টমের শয়তানি দেখে ফেলেছে। পানিতে বৈঠা নামিয়ে রেখেছিল, টান দিয়ে হঠাৎ নৌকাটাকে এগিয়ে দিয়েছে। তারা সবাই ছেকে ধরল টমকে। ধমক দিল, 'এত নিষ্ঠুর তুমি হতে পারলে? চেম্বার তো মরেই যাচ্ছিল!'

টম বারবার এক কথা বলছে, 'তোমাদের চোখের ভুল–নৌকো যেখানে ছিল সেখানেই আছে। চেম্বার আন্দাজে ভুল করছে। ব্যাটা জখম হওয়ায় আমি খুশি। কেনা গোলামের বাচ্চা, তার আবার এত ফুর্তি করার শখ হবে কেন?'

ছেলেদের ভিড় থেকে কে যেন বলল, 'এই শোন, চেম্বার আহত হয়ে পড়ে আছে, কাজেই টমের হয়ে এখন কেউ লড়তে আসবে না। এই সুযোগ! আয়, ওর খাড়া নাকটা আমরা ভোঁতা করে দিই।'

বাকি সবাই এই কথা শুনে একেবারে মেতে উঠল। জোর করে টমকে ডাঙায় ধরে আনল তারা। তাকে ঘিরে একটা বৃত্ত রচনা করল। প্রতিবার একজন করে লড়ছে। কিন্তু টম লড়বে কি তার গায়ে শক্তি কোথায়! লড়াই আসলে কথার কথা, টম

একতরফা মার খেয়ে মরছে। এতদিন সে কারও সঙ্গে লড়েনি, মারামারি করার দরকার হলে চেম্বারকে সামনে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু আজ কাকে ঠেলে দেবে? চেম্বার যেহেতু অসুস্থ, কাজেই খাও বেদম মার।

ছেলেরা চিৎকার করে বলছে, 'ওরে, থামরে, থাম! একেবারে শেষ করে ফেলিস না, আমার জন্যে একটু রাখিস!'

ছেলেরা প্রত্যেকেই হাতের সুখ মেটাল। একটু পরই পড়ে গেল টম, তার আর উঠে দাঁড়াবার সাধ্য নেই। কপালে সারি সারি কালো দাগ ফুটেছে, নাকে-মুখে রক্ত। পা মচকে গেছে, হাত ভেঙে গেছে। মরে যেতে পারে, এই ভয়েই ছেলেরা থামল। তারা আবার ফিরে এল চেম্বারের পাশে। ইতিমধ্যে খানিকটা সুস্থ বোধ করছে সে।

ছেলেরা তাকে বলল, 'তোমার ওই মনিব, টম, স্রেফ একটা জানোয়ার। নৌকাটাকে ইচ্ছে করে সামনে এগিয়ে দিয়েছিল, আমরা দেখেছি। তা, এখন তুমি সুস্থবোধ করছ তো?'

চেম্বার কিছু বলবার আগেই কাতর গলায় টম বলে ওঠে, 'দেখ রে, চেম্বার, দেখ! তুই চোখ বুজে পড়ে থাকলি, আর ওরা আমাকে মেরে ভর্তা বানাল! এবার ওঠ, চেম্বার! উঠে ওদের মার! কি হলো, মার!'

চেম্বার আঁতকে উঠল। 'আমি মারব? এই আহত অবস্থায়? ওদের সবাইকে একসঙ্গে? দেখো, মনিব, যা সম্ভব নয় তা বোলো না!'

আবার রেগে উঠল টম। কিন্তু এবার রাগ করেও কোন লাভ

হলো না। চেম্বারের মাথা ঘুরছে, লড়বে কি!

এই ঘটনার পর টমের মধ্যে সামান্যই পরিবর্তন ঘটল। তার অহঙ্কার খানিকটা ভেঙেছে, তবে এবার সে ভিতু হয়ে পড়ল। এখন আর সে কারও পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করে না, কারণ জানে গায়ে জোর না থাকায় তাকেই মার খেতে হবে। গোলাম? গোলাম যতই প্রভুভক্ত হোক, তার নিজেরও তো সুখ-দুঃখ বোধ আছে।

তারপর ওদের বয়স পনেরো হলো। এখন আর চেম্বার সারাক্ষণ টমের ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায় না। এরইমধ্যে তাগড়া যোয়ান হয়ে উঠেছে সে। পার্সি পরিবারের কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজগুলো তাকে দিয়েই করানো হয়। তাছাড়া; ওই রকম একটা প্রকাণ্ডদেহী গোলামকে নিয়ে ভদ্র সমাজে টমই বা যায় কিভাবে? লোকে যে হাসাহাসি করবে।

টমের এখন অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটেছে, তারা সবাই শৌখিন ও ধনী পরিবারের সন্তান। টম নিজে এক কাঠি সরেস, মানে তাদের চেয়েও বেশি শৌখিন। পার্সি দ্রিস্কল একজন ধনকুবের, তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী সে। ডসন ল্যান্ডিঙে বিলাসিতা করার, টাকা ওড়াবার যতগুলো ঠিকানা আছে, সব জায়গায় টমের প্রচণ্ড খাতির। এরইমধ্যে রটে গেছে, টাকা ওড়াতে তার জুড়ি মেলা ভার।

এতদিন ছেলের সব আবদারই রক্ষা করেছেন পার্সি দ্রিস্কল। কত টাকা লাগবে—নাও না, নাও! তবে ছেলেটা যে মানুষের মত মানুষ হচ্ছে না, এটা তিনি খানিকটা নিজের চোখে দেখেছেন,

খানিকটা আত্মীয়স্বজনের মুখে শুনেছেন। লেখাপড়ায় টম নাকি একেবারেই গবেট। আচার-ব্যবহারেও শোনা যায় অত্যন্ত অপরিশীলিত। এই বয়সেই সে নাকি সব রকম কুকর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু তবু টম তাঁর সন্তান, একমাত্র বংশধর। আদর্শ ছেলে হলে খুশি হতেন, কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে বলে তো আর ফেলে দিতে পারেন না! পার্সি পরিবারের যোগ্য মান-মর্যাদা নিয়ে সমাজে তাকে টিকে থাকতে হবে। কাজেই ছেলেকে সম্ভাব্য সবরকম ভাবে পার্সি সাহায্য করবেন। টাকা নিচ্ছে, নিক।

বাপের এরকম প্রশ্রয় পেয়েই একেবারে নরকে নেমে গেল টম।

তারপর পার্সি দ্রিঙ্কল একটা গুরুতর বিপদে পড়লেন। বেশ কয়েক বছর ধরেই তাঁর জমি কেনা-বেচার ব্যবসা ভাল যাচ্ছিল না। কত আর লোকসান দেয়া যায়। অগত্যা ব্যবসাটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন তিনি। ব্যবসা বন্ধ, অথচ ওদিকে বাজারে তাঁর অনেক দেনা। এই দেনা এখন তিনি পরিশোধ করবেন কিভাবে? এক সময় অনেক দামী জিনিস কিনে রেখেছিলেন, বিপদে পড়ে সেগুলো পানির দামে বিক্রি করে দিলেন। ঋণ তো শোধ করতেই হবে।

ভাগ্যের কি ফের, ধনকুবের পার্সি দ্রিঙ্কলকে আজ প্রায় নিঃস্ব বললেই হয়। অবস্থা এতই খারাপ, দাস-দাসীদেরও বেচে দিতে হলো। রাখার মধ্যে রাখলেন শুধু রক্সি আর চেম্বারকে। তাঁর নিজের শরীরও ভেঙে পড়েছে ইদানীং—দুঃখ আর দুশ্চিন্তায়। রক্সি

আর চেম্বার তার সেবা-যত্ন করবে, এই আশাতেই ওদেরকে রেখে দিলেন তিনি।

তারপর পার্সি বুঝতে পারলেন, তাঁর দিন ঘনিয়ে এসেছে। বড় ভাই জজসাহেবকে ডেকে পাঠালেন তিনি। একটা উইল করবার ইচ্ছে। জজ দ্রিস্কল ইতিমধ্যে সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর পারিবারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল।

ছোট ভাইয়ের অবস্থা খারাপ দেখে তিনি বললেন, 'টমকে নিয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না। আমার যেহেতু ছেলেপুলে নেই, টমকে আমিই নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখব। তোমার আর কি সাহায্য দরকার, তাই বলো।'

পার্সি বললেন, 'রক্সিকে আমি মুক্তি দিতে চাই। আমার সংসারে তার অনেক অবদান।'

ভাইয়ের ইচ্ছাগুলো লিখে নিচ্ছে জজ দ্রিস্কল। 'বেশ।'

'রক্সির ছেলে চেম্বার–খুবই বিশ্বাসী, আর কাজের ছেলেও বটে...'

'ওর কথা তোমাকে চিন্তা করতে হবে না,' জজ দ্রিস্কল বললেন। 'ওকে তুমি যদি বিক্রি করতে চাও, ন্যায্য দাম দিয়ে আমিই কিনে নেব।'

'সেকি, না! তুমি যদি ওকে নিতে চাও, দাম দেয়ার কথা ওঠে কিভাবে! আমি ওকে তোমার হাতেই তুলে দিলাম। অন্য যে-সব সম্পত্তি আছে...'

সবই লিখে নিলেন জজ দ্রিস্কল। ঠিক হলো, বেচা-বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে পার্সির ঋণ পরিশোধ করা হবে।

তারপরও যদি কিছু বাঁচে, টমের নামে ব্যাংকে জমা হবে।

উইল করার কয়েক দিন পরই মারা গেলেন পার্সি দ্রিস্কল। বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে টম আর চেম্বারকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন জজ সাহেব। ক্রীতদাসী রক্সি মুক্তি পেয়ে ডসন ল্যান্ডিং ত্যাগ করে চলে গেল। মিসিসিপি স্টীমার কোম্পানিতে পরিচারিকার চাকরি পেয়েছে সে।

তিন

বাড়ি বদল হয়েছে, তবে আগের মত একই বাড়িতে বসবাস করছে টম আর চেম্বার। জজ দ্রিস্কলের আপন ভাইপো চেম্বার, কিন্তু গোলামের পরিচয় নিয়ে এ-বাড়িতে গোলামি করতে এসেছে সে। আর প্রকৃত দাসী-পুত্র টম সম্ভ্রান্ত পরিবারের পরিচয় নিয়ে ভদ্র সমাজের সম্মান আর ভক্তি উপভোগ করছে।

জজ দম্পতি নিঃসন্তান। টম তো নয়, হাতে যেন একেবারে আকাশের চাঁদ পেয়েছেন তাঁরা। কী খাওয়াবেন, কী পরাবেন, তাই নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন দু'জন। টমের ভাগ্য আগের চেয়ে ভাল এখন। বাবার কাছে টাকা চাইলেই পাওয়া যেত, চাচার কাছে না চাইতেই পাওয়া যায়। কোন একটা জিনিস ভাল লাগলেই হয়,

টমের জন্যে জজ দ্রিস্কলের সেটা কেনা চাই-ই। টমের কোন শখই তিনি অপূর্ণ রাখতে চান না। টমের জন্যে তাগড়া একটা ঘোড়া কিনলেন। তার স্ত্রী কিনলেন একগাদা নতুন ডিজাইনের ফার্নিচার, টমের ড্রইংরুম সাজানো হবে। মনে মনে তৃপ্তির হাসি হাসে টম–বাবার চেয়ে চাচা ভাল!

শুধু একটা ব্যাপারে জজ চাচা আপোস করতে রাজি নন। টম লেখাপড়ায় বেশি দূর যেতে পারেনি, এটা তাঁর একেবারেই ভাল লাগছে না। জজের ভাইপো, লেখাপড়া না শিখলে যে মান থাকে না! কোন রকমে কলেজ থেকে একবার পড়িয়ে আনতে পারলে তাকেও জজ বানিয়ে ফেলা খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। ভাইপোকে তিনি বোঝাতে লাগলেন, পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে এটুকু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে তাকে।

জজ দ্রিস্কল যতই বোঝান, কোন কাজ হল না; হলো দুই কলেজ ফেরত যুবকের পরামর্শে। কলেজে কি ঘটে, টমকে তার বিবরণ দিল তারা। সেই বিবরণ শুনে লোভে পড়ে গেল টম। যুবকেরা তাকে বলল, 'আরে বোকা, কলেজে কত মজা জানিস? সেখানে পড়াশোনা হয় ঘোড়ার ডিম। খালি মদ খাবি আর জুয়া খেলবি। আমরা তো তাই করেছি।'

সেদিনই চাচাকে জানিয়ে দিল টম, 'তোমার কথা ফেলতে পারলাম না, চাচা। তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি কলেজে ভর্তি করে দাও, দেখি পরিবারের মর্যাদা কতটুকু বাড়াতে পারি।'

স্ত্রীকে জজসাহেব বললেন, 'ভাল বংশের কী গুণ দেখলে তো! বিদ্যা অর্জনের দিকে হৃদয়ের টান না থেকেই পারে না!'

স্কুলে ভাল লেখাপড়া করেনি টম, কাজেই কলেজে তার ভর্তি হতে পারার কথা নয়। কিন্তু তখনকার দিনে সুপারিশে অসম্ভবকে সম্ভব করা যেত, জজসাহেবও ভাইপোর জন্যে তাই করলেন।

কলেজে ঢুকেই খোঁজ শুরু করল টম—কার কাছে মদ পাওয়া যায়, জুয়ার আড্ডাটা কোথায় বসে। হাজার হোক কলেজ, এ-সব প্রকাশ্যে চলে না, এটাই তার ধারণা ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল গোপনীয়তার তেমন কোন ঘালাই নেই। আসলে কি ঘটছে অনেকেই তা জানে, এমন কি কলেজ কর্তৃপক্ষও জানেন। সন্ধ্যার পর ছেলেরা যেখানে আড্ডা দেয় সেদিকে ভুলেও শিক্ষকরা পা বাড়ান না। তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন যে নাক গলালেই ঝামেলা হবে। এরা সবাই সমাজের প্রভাবশালী লোকের ছেলে, এদের সাথে লাগতে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মদ আর জুয়ায় হাতেখড়ি হলো টমের। এই দুই কুকর্মে ডাবল প্রমোশন পেতে লাগল সে।

চাচার কাছ থেকে ভালই টাকা পাচ্ছে টম, কিন্তু মদ-জুয়ার পিছনে খরচ এত বেশি যে সে-টাকায় তার কুলাচ্ছে না। তাই চাচাকে প্রায়ই তার চিঠি লিখে অতিরিক্তি টাকা চাইতে হয়। চিঠি পাওয়ামাত্র জজসাহেবও ভাইপোকে আরও টাকা পাঠিয়ে দেন। সম্প্রতি স্ত্রী মারা যাওয়ায় টমের ব্যাপারে ভদ্রলোক আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। টাকা পাঠান, সেই সঙ্গে চিঠিতে প্রশ্ন করেন, 'মন লাগিয়ে লেখাপড়া করছ তো, বাপধন? ভুলে যেয়ো না, তোমাকেই ড্রিস্কল পরিবারের নাম রাখতে হবে।'

লেখাপড়া? ধুত্তোর লেখাপড়া! ওই ঝামেলার কথা মনে

পড়লেই গলা কাঠ হয়ে যায় টমের। তখন পুরো একটা বোতল না গিললে সুস্থবোধ করে না সে।

কলেজে লেখাপড়া করার জন্যে কেউ কোন চাপ দেয় না ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা তো নেয়ই। আর পরীক্ষায় যারা ফেল মারে তাদেরকে বাড়ি ফিরে যেতে হয়। টম ড্রিঙ্কল কি করবে? এই সংকটে একটু বুদ্ধির পরিচয় দিল সে। এটাকে ভীরুতার পরিচয়ও বলা যায়।

সে সিদ্ধান্ত নিল, পরীক্ষাই দেবে না।

পরীক্ষার যখন আর বেশি দেরি নেই, চাচাকে চিঠি লিখল টম, 'পড়াশোনার চাপে আমি অসুস্থ হয়ে ভেঙে পড়েছি। শহরে ফিরে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখাবার কথা বলছে সবাই। কিন্তু চিকিৎসা করাতে হলে পরীক্ষা দেয়া হয় না। এখন তুমি যা বলবে তাই হবে।'

চাচা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'জীবনের চেয়ে পরীক্ষা বড় নয়। আগে তোমার সুচিকিৎসা হওয়া দরকার। এই চিঠি পাওয়ামাত্র ডসন ল্যান্ডিঙে ফিরে এসো।'

টম এবার লিখল, 'তোমার আদেশ মতই কাজ করব। তবে রাতদিন খেটে পড়াশোনা করার পর পরীক্ষা দিতে পারছি না, এটা ভাবলেই আমার কান্না পাচ্ছে। তুমি চিন্তা করবে তাই একটা কথা এতদিন জানাইনি। এখানে একজন ডাক্তারকে দিয়ে আমি চিকিৎসা করিয়েছিলাম। কিন্তু তাতে আমার অসুস্থতা আরও বেড়ে গেছে। চিকিৎসা বাবদ অনেক টাকা খরচ করে ফেলায় দেনাও বেড়েছে। এই দেনাটা শোধ না করে এখান থেকে আমার যাওয়া

চলে না। দ্রিঙ্কল পরিবারের একমাত্র বংশধর ঋণ রেখে পালিয়ে গেছে, আমি চাই না এ-কথা তোমাকে শুনতে হোক।'

বংশমর্যাদার দিকে ভাইপোর এত খেয়াল! জজসাহেব একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। টম বেশ মোটা টাকাই চেয়ে পাঠিয়েছে, হাসিমুখে তা মানি অর্ডার করলেন চাচাজান। টাকা ধার করে জুয়া খেলেছিল টম, সেই ধার কোন রকমে মিটিয়ে দিল সে। তারপর লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে ফিরে এল ডসন ল্যান্ডিঙে।

মদ খেয়ে আর রাত জেগে আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে টম। ভাইপোকে দেখে জজ দ্রিঙ্কল প্রায় কেঁদে ফেললেন। শহরের সেরা চিকিৎসকদের ডেকে বাড়িতে জড়ো করলেন তিনি।

তখনকার দিনে চিকিৎসকরাও ছিলেন তেমনি, টমের মতই ফাঁকি দিয়ে বিদ্যার পাঠ চুকিয়েছেন। টম তাঁদের যা বোঝাল তাঁরাও তাই বুঝলেন। প্রচুর দাওয়াই আর উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন সবাই। উপদেশগুলো কি কি? ভাল ভাল খেতে হবে, প্রচুর বিশ্রাম নিতে হবে, আর কোন অবস্থাতেই কলেজে ফিরে যাওয়া চলবে না।

ভাইপোর উঠতি বয়স, এই বয়সের ছেলেদের কত রকম খেয়ালখুশি থাকে, বন্ধু-বান্ধবদের পিছনেও তো খরচ করতে হয়, তাই টম না চাইতেই তার টেবিলে বান্ডিল বান্ডিল টাকা রেখে আসেন জজ সাহেব।

কিন্তু তাতেও টমের অভাব দূর হয় না। এ যেন তলাবিহীন ঝুড়ি, যতই ঢালা হোক সব গায়েব হয়ে যায়। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে চাচার কাছে টাকা চাইতে নির্লজ্জ টমেরও লজ্জা লাগছে।

শহরে ফেরার পর মদ আর জুয়া আরও ভালভাবে ধরেছে টম। নতুন নতুন আড্ডায় যাবার সুযোগ ঘটছে এখানে, নিত্য-নতুন বন্ধুও জুটছে। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চলছে কে কত টাকা ওড়াতে পারে। ডসন ল্যান্ডিঙে যত দুশ্চরিত্র যুবক আছে, তাদের সবার সঙ্গে খাতির হয়ে গেল টমের। এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে টাকা চাই, আরও টাকা চাই। কিন্তু স্বার্থপর টমও বুঝতে পারছে, তার এই টাকার খাই মেটানোর সাধ্য এমন কি সদয় চাচারও নেই। কাজেই টাকা কামানোর পথ খুঁজতে লাগল সে।

সৎপথে টাকা রোজগার করতে হলে বিদ্যাবুদ্ধি তো লাগেই, সবচেয়ে বেশি লাগে নিষ্ঠা। তার সঙ্গে থাকা চাই শ্রম দেয়ার মানসিকতা, নিয়ম মেনে চলার প্রবণতা, স্বাচ্ছন্দের চেয়ে প্রয়োজনটাকে বড় করে দেখতে পারা। কিন্তু এ-সবের কোনটাই টমের চরিত্রে নেই। কাজেই টাকা কামাতে অসৎ পথে নামতে হলো তাকে। চুরি, রাহাজানি, প্রতারণা—এমনি আরও অনেক পথ আছে টাকা কামাবার। সাহস করে একটা বেছে নিলেই হলো।

বন্ধুদের মধ্যে ধনী লোকের ছেলেরাও আছে। শিকার হিসেবে প্রথমে টম তাদেরকেই বেছে নিল। এক বন্ধুকে নিয়ে হোটেলে এল সে, পকেটে বিশেষ এক ধরনের পাউডার ভরা পুরিয়া। দু'জন এক কোণে বসে মদ খাচ্ছে, বন্ধুর অগোচরে তার গ্লাসে পুরিয়ার পাউডার মিশিয়ে দিল টম। কয়েক মুহূর্ত পরই অসুস্থ হয়ে পড়ল বন্ধু। অমনি অভিনয় শুরু করে দিল টম। অসুস্থ বন্ধুর সেবা করার ছলে তার শার্টের বোতাম খুলে দিল, তারপর চোখের পলকে ভেতরের পকেট থেকে টাকার ছোট ব্যাগটা বের করে নিল। টাকা

বের করে ব্যাগটা আবার যথাস্থানে রেখে দেয়া, সে তো মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার। বন্ধু সুস্থ হবার আগেই টমের সব কাজ শেষ। হোটেলের বিল জোর করে সেই মেটাল, এমন কি বন্ধুকে তার বাড়িতে পৌঁছেও দিল। বিদায় নেয়ার সময় বলল, 'এবার তোমার একটু সংযমী হওয়ার দরকার, দোস্ত। তা না হলে শরীর যে বেঁকে বসবে!'

এভাবে বন্ধুদের পকেট মেরে বেশ কিছুদিন ভালই চলল টম। কিন্তু বন্ধুর সংখ্যাও তো সীমিত। তাছাড়া, এক সময় টমকে তারা সন্দেহ করতে শুরু করল। তার সঙ্গে একা কেউ কোথাও বসতে চায় না। দাওয়াত-নিমন্ত্রণ এড়াবার জন্যে বন্ধুরা অদ্ভুত সব অজুহাত খাড়া করছে। টমের আয় আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেল।

যা আছে কপালে, এই ভেবে এক রাতে সিঁদকাঠি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল টম। ধনী অনেক লোকের বাড়িতেই তার আসা-যাওয়া আছে। সে-সব বাড়ির প্রতিটি ঘর তার চেনা, পোষা কুকুরগুলো তার পরিচিত। কোন ঘরের কোন দেরাজে থাক থাক করে টাকার বান্ডিল সাজানো আছে, টম জানে। তার কাছে এমন চাবি আছে, যে চাবি দিয়ে সব তালাই খোলা যায়। কাজেই টাকার বান্ডিল পকেটে ভরে চুপিচুপি পালিয়ে আসতে খুব বেশি সময় লাগে না তার।

এভাবেই পাকা চোর হয়ে গেল টম ড্রিস্কল। পিতৃপরিচয়হীন একটা শিশুকে ছেঁড়া কাঁথা থেকে তুলে রাজসিংহাসনে বসিয়েছিল রক্সি। টম সেই সিংহাসনে এখনও বসে আছে ঠিকই, কিন্তু সিংহাসনে বসেই আস্তাকুঁড়ের নোংরা ঘাঁটছে।

জজ দ্রিস্কল বার্ধক্যের কারণে সংসার ও জীবন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছেন। আজকাল খুব কমই বাইরে বের হন তিনি, প্রায় কারও সঙ্গেই মেলামেশা করেন না। টম কি করছে না করছে সে-খবরও তাঁর অজানা। কিন্তু টমের কুকীর্তি এতটাই মাত্রা ছাড়াল যে কিছু কিছু গুজব এক সময় তাঁর কানেও এল। চুরির কোন প্রমাণ নেই, তাই এত বড় অভিযোগ তোলার সাহস হয়নি কারও। টম যে জুয়াড়ী আর মদ্যপ হিসেবে শহরে বদনাম কিনেছে, শুধু এই কথাটাই জজ দ্রিস্কলের কানে এল।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। ভাইপোকে নিয়ে তাঁর এত স্বপ্ন, সে এই ডসন শহরেই একদিন জজ হবে, তার পাণ্ডিত্য-আভিজাত্য-সদগুণ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে মানুষ, সেই কিনা জুয়া খেলে মদ খেয়ে বংশের গায়ে কলঙ্ক লেপন করছে? ছিহ্, ছিহ্!

নানা সূত্র থেকে খোঁজ-খবর নিলেন জজসাহেব। বিচারক মানুষ, সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করবেন কেন? খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন, অভিযোগ মিথ্যে নয়। নিশ্চিত হবার পর কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন জজ দ্রিস্কল। টমকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন তিনি। আগেই উইল করেছেন, সেটা বদলে ফেললেন। কাজটা করতে তাঁর খুব কষ্ট হলো। কিন্তু বিবেকবান মানুষ তিনি, আবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে কর্তব্যে অটল থাকলেন।

টম চোখে অন্ধকার দেখল। বাপের কাছ থেকে কিছুই সে পায়নি, এখন চাচার কাছ থেকেও কিছু পাবে না। এই বিশাল সয়-সম্পত্তি তার হাতের মুঠোতেই ছিল, চোখের পলকে সব

নাগালের বাইরে চলে গেছে। কী সর্বনাশ! এখন উপায়?

একমাত্র উপায় চাচার পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাওয়া। তাই করল টম। নির্লজ্জ হতে তার বাধে না। চাচার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল সে। কাঁদতে কাঁদতেই প্রতিজ্ঞা করল, এখন থেকে নিজেকে শুধরে নেবে সে, জীবনে ভুলেও কখনও জুয়ার আসরে বসবে না, মাতালও হবে না। ভাইপোকে এভাবে কাঁদতে দেখে জজ দ্রিস্কলও কেঁদে ফেললেন। ছোট ভাই পার্সির সন্তান, বংশের একমাত্র আলো, তাকে কি কখনও এককথায় ত্যাগ করা যায়?

ভাইপোকে দিয়ে আরেকবার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন তিনি। পাপকর্ম থেকে চিরকালের জন্যে দূরে সরে থাকবে সে। উইলটা তখুনি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। ঠিক হলো, আরেকটা উইল তৈরি করা হবে, তাতে লেখা হবে জজ দ্রিস্কলের সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একমাত্র মালিক হবে টম দ্রিস্কল।

জোর করে অনেক কাঁদতে হয়েছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেকে ছোট করতে হয়েছে, কাজেই টমের মন-মেজাজ সাংঘাতিক গরম হয়ে ছিল। পরদিন সকালে অনেক বেলায় তার ঘুম ভাঙল। মেজাজ এখনও ভাল হয়নি, বরং আরও খারাপ হয়েছে–গোটা দুনিয়ার ওপর প্রচণ্ড এক আক্রোশ অনুভব করছে সে।

ঠিক এই সময় আগুনে যেন ঘি পড়ল। যে চেম্বার তার দু'চোখের বিষ, সেই চেম্বারকেই দেখল দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকছে।

ঘরে ঢুকে সালাম দিল চেম্বার, তারপর সবিনয়ে বলল, 'রক্সি

এসেছে, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।'

কথাটা ভাল করে শোনেওনি টম, অকস্মাৎ বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল চেম্বারের ওপর। চাচার ওপর রাগে আগুন হয়ে ছিল সে, চেম্বারকে দেখে সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। চড়, ঘুসি, কিল, লাথি সমানে চলল।

তেইশ বছর বয়সে দৈত্য হয়ে উঠেছে চেম্বার। যদি ইচ্ছে করে, দু'হাতে ধরে পিষেই মেরে ফেলতে পারে টমকে। কিন্তু আজ সে মনে-প্রাণে ক্রীতদাস, নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে পারে না। মনিব তো মারবেই, সে মার মুখ বুজে সহ্য করতে হবে কেনা গোলামকে। পাল্টা আঘাত হানার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না। প্রচণ্ড মার খাচ্ছে চেম্বার, আর কাতর গলায় বলছে, 'আর মেরো না, মনিব, আর মেরো না!'

চেম্বারের কাতর অনুরোধে টম থামত না, থামল ক্লান্ত হয়ে পড়ায়। মার খেয়েছে চেম্বার, কিন্তু দেখা গেল টমের অবস্থাই কাহিল হয়ে পড়েছে। ফোঁস ফোঁস করে হাঁপাচ্ছে সে। ধপ করে বিছানায় বসে সে জানতে চাইল, 'এত সকালে কি কারণে বিরক্ত করতে এলি?'

চোখ মুছতে মুছতে চেম্বার বলল, 'মা এসেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

'মা মানে? রক্সির কথা বলছিস?' টমের চোখ কপালে উঠে গেল। 'ওটা এখনও বেঁচে আছে? তা আমার কাছে কি চায়? আচ্ছা, যা, পাঠিয়ে দে।'

চেম্বার চলে গেল। একটু পরই রক্সি ঢুকল ঘরে। দরজা

থেকেই শুরু করল সে, 'ওরে আমার সোনা! ওরে আমার মানিক! ওরে আমার বুকের ধন!'

রক্সি আবার ডসন ল্যান্ডিঙে ফিরে এল কেন, সেটা বোঝার জন্যে একটু পিছন দিকে তাকাতে হয়। পার্সি ড্রিস্কল মারা যাবার আগে ক্রীতদাসী রক্সিকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। রক্সি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল, এমন সৎ, নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবতী দাসী সারা দুনিয়া খুঁজলেও দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে না। মারা যাবার আগে তিনি তো দেখেই গেছেন, নিজের ছেলের চেয়েও মনিবের ছেলেকে বেশি ভালবাসে সে।

কিন্তু তিনি তো আর জানতেন না যে যাকে তিনি নিজের ছেলে ভাবছেন সে আসলে তাঁর ছেলেই নয়, ক্রীতদাসী ওই রক্সিরই ছেলে সে। এ তথ্য যদি জানতেন, সন্দেহ নেই এই পাপিষ্ঠা রক্সিকে নির্ঘাত জ্যান্ত কবর দিতেন তিনি।

সে যাই হোক, মুক্তি পেয়ে মিসিসিপি স্টীমার কোম্পানিতে চাকরি নিল রক্সি। শৌখিন যাত্রীরা প্রচুর বকশিশ দেয়, ফলে আয়-রোজগার তার ভালই হচ্ছিল। গত আট বছরে ব্যাংকে তার চারশো ডলার জমা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে দু'দিক থেকে দুটো বিপদে পড়ল সে। ব্যাংকটা ফেল মারল, বাতের ব্যথায় পঙ্গু হয়ে গেল শরীরটা। অচল রক্সিকে স্টীমার কোম্পানি চাকরিতে রাখতে রাজি হলো না। কাজ হারিয়ে রক্সি চিন্তায় পড়ে গেল। এখন তাকে আশ্রয় দেবে কে?

অনেক চিন্তা করে রক্সি উপলব্ধি করল, ডসন ল্যান্ডিং ছাড়া তার আর কোথাও যাবার জায়গা নেই। দুনিয়ায় একেবারে একা

নয় সে–উপযুক্ত এক ছেলে আছে তার, সে ছেলেকে বসিয়ে রেখে এসেছে বলতে গেলে রাজ-সিংহাসনে। সেই ছেলের বাপ কে, রক্সি নিজেও তা জানে না, জন্মের পর তার নাম রাখা হয়েছিল চেম্বার। রক্সি কৌশল করে তার নাম পাল্টে দেয়। চেম্বার হয় টম–দ্রিস্কল পরিবারের একমাত্র বাংশধর।

টম দ্রিস্কল, তার ছেলে! ছেলে অবশ্য জানে না রক্সির সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। রক্সির ধারণা, এই তথ্য কোনদিনই প্রকাশ করবার প্রয়োজন হবে না। টম দ্রিস্কল তাকে মা বলে না জানলেও, ধাই-মা বলে তো জানে। সে তো রক্সির বুকের দুধ খেয়েই মানুষ হয়েছে। অন্তত এই কথাটা টম কোনদিন অস্বীকার করতে পারবে না। ধাই-মার প্রতি নিশ্চয়ই সে কৃতজ্ঞ! কাজেই রক্সির এই দুঃসময়ে নিশ্চয়ই তাকে প্রাসাদের এক কোণে একটু ঠাঁই দিতে কার্পণ্য করবে না।

কিন্তু যদি না দেয়? সেক্ষেত্রে গোপন অস্ত্রটা ব্যবহার না করে রক্সির কোন উপায় থাকবে না। টম রাজপ্রাসাদে বসবাস করছে ঠিকই, কিন্তু সেটা তাসের প্রাসাদ, রক্সি ইচ্ছে করলেই ভেঙে দিতে পারে। টম দ্রিস্কলের আসল পরিচয় ও জন্মরহস্য যদি প্রকাশ পায়, দ্রিস্কল পরিবারের লোকেরা তাকে লাথি-ঝাঁটা মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। কাজেই টমকে যদি একটু আভাস দেয় রক্সি, মায়ের পায়ে গড়াগড়ি খাবে না সে?

কোন সন্দেহ নেই, টম তার হাতের মুঠোতেই আছে। কাজেই রক্সির চিন্তা কি!

দরজা থেকেই আকুল হয়ে ছুটে এল রক্সি, বারবার বলছে,

'ওরে আমার সোনা রে! ওরে আমার মানিক রে...'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল টম। 'এখানে মরতে এসেছ কেন? কী চাই তোমার?'

টমের অগ্নিমূর্তি দেখে থমকে গেল রক্সি। এরকম অভ্যর্থনা সে আশা করেনি। ঢোক গিলে কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে এই মুহূর্তে যেটার প্রয়োজন শুধু সেটার কথাই বলল, 'কী চাই? একটা টাকা চাই, বাপ।'

'টাকা? টাকা?' কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করে উঠল টম। 'তোমার সাহস তো কম নয়! তুমি আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছ!'

রক্সি বলল, 'বিপদে পড়েছি, দেবে না? আমি যে তোমাকে বুকে করে মানুষ করেছি, সে-কথা কি তুমি ভুলে গেছ?'

'বুকে করে মানুষ করেছিস তো কি হয়েছে? তুই আমাদের কেনা বাঁদী, বাঁদীর দায়িত্ব পালন করেছিস। সব বাঁদীই তাই করে। এখানে যত দিন ছিলি, গামলা ভর্তি করে খেয়েছিসও তো। এখন তাহলে টাকা চাইতে এসেছিস কেন? টাকার চেয়ে বড় জিনিস স্বাধীনতা পেয়েছিস, তাতেও তোর মন ভরেনি? এতদিন পরে মনে করিয়ে দিতে এসেছিস বুকে করে মানুষ করেছিস? যা, ভাগ!' হাত তুলে দরজাটা দেখিয়ে দিল টম।

রক্সি গম্ভীর হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বলল সে, 'আমার আর তোমার যে সম্পর্ক, তা কোনদিন ছিন্ন হবার নয়, বাবা। আমার অনুরোধ...না, অনুরোধ নয়, দাবি! সেই দাবি তুমি যদি অস্বীকার করো, তাতে তোমার বিপদ হবে, টম। এখন থেকে প্রায়ই দু'চার

টাকা দিয়ে আমাকে তোমার সাহায্য করতে হবে, বাপ।'

'কি বললি? ভয় দেখাচ্ছিস? জোর করে টাকা নিবি? এমন লাথি মারব না!' লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল টম।

রক্সি এক চুল নড়ল না। 'সাবধান, টম! আমার গায়ে হাত তুললে তুই নিজের সর্বনাশ করবি! জোর? হ্যাঁ, জোর আমার আছে। কিন্তু প্রয়োজন না হলে সে জোর আমি দেখাতে চাই না। লাথি মারবি কি, তুই বরং আমার পায়ে ধর। শুধু পায়ে ধরলেই তোর অপরাধ আমি ক্ষমা করতে পারি।'

হতভম্ব হয়ে গেল টম। সে কি দুঃস্বপ্ন দেখছে? রক্সি তাদের ক্রীতদাসী ছিল, তার মুখ থেকে এ-সব কথা বেরুচ্ছে? 'পায়ে ধরব? তোর? হাসালি দেখছি!'

রক্সি অটল দাঁড়িয়ে। কিছু বলছে না।

টম বলল, 'পায়ে না ধরলে কি করবি? ছুরি মারবি আমাকে?'

রক্সি হেসে উঠল। 'না। ছুরি মারলে তো কষ্ট পাবি না, মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে যাবে। আমি তোকে একটু একটু করে আগুনে পোড়াব, টম। কিভাবে, বলি? তোর সম্পর্কে গোপন একটা কথা জানি আমি, সেই কথাটা তোর চাচাকে শুধু বলে দেব। তাতেই তোর জীবনে আগুন জ্বলে উঠবে, একেবারে দাউ দাউ করে!'

'গোপন কথা? কি গোপন কথা?' ঘাবড়ে গেল টম।

'সে এমন এক কথা, জজসাহেবের কানে একবার গেলেই হয়, সেই মুহূর্তে তোকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।'

টম কাঁপতে শুরু করেছে, যেন পায়ের নিচে মাটি নেই। তার

ধারণা হলো, যেভাবেই হোক রক্সি জানতে পেরেছে, সে চোর। এই কথাটাই চাচাকে বলে দেয়ার ভয় দেখাচ্ছে।

'কি, চুপ করে আছিস যে?' জিজ্ঞেস করল রক্সি। 'পায়ে ধরতে রাজি তাহলে? নাকি ভাবছিস গোপন কথাটা কি না জেনে পায়ে হাত দিবি না? শোন, কথাটা এখুনি জানাতে আমার কোন আপত্তি নেই। শোনার পর বুঝতে পারবি, আমার কথামত না চলে তোর কোন উপায় নেই। আমিই তোকে বাঁচাতে পারি, আবার আমিই তোকে মারতে পারি।'

আতঙ্কিত টমকে তার জন্ম ও পরিচয় রহস্য খুলে বলল রক্সি। টম ছিল ক্রীতদাসী রক্সির সন্তান! তাকে মনিবের সন্তান বানিয়েছে এই রক্সিই। সমস্ত বিবরণ দেয়ার পর সে বলল, 'এখন থেকে আমাকে মায়ের যোগ্য সম্মানই অবশ্যই দিতে হবে, টম! জজসাহেব তোকে যে হাতখরচা দিচ্ছেন, তার অর্ধেক আমার চাই। দিলে ভাল, না দিলে তোর সর্বনাশ। তোকে আমি পেটে ধরেছি, কাজেই বাধ্য না হলে আমি তোর কোন ক্ষতি করব না।

'আমার কথামত চললে সবদিক থেকে উপকার হবে তোর। তোর বুদ্ধি কম, আমার কাছে ধার নিবি, তাহলেই দু'জনের কোন অভাব থাকবে না। আবার বলছি, আমি প্রকাশ না করলে তোর জন্মরহস্য কেউ কোনদিন জানতে পারবে না।'

অসহায় টম চোখে অন্ধকার দেখল। কিছু করার নেই, রক্সির প্রতিটি দাবি মেনে নিতে হলো তাকে। চিন্তা করার জন্যে একা হওয়া দরকার, তাই আপাতত নগদ পাঁচ ডলার দিয়ে বিদায় করল রক্সিকে।

চার

মিসেস কুপার তাঁর একমাত্র মেয়ে রোয়েনাকে নিয়ে এই ডসন ল্যান্ডিঙেই থাকেন। সম্বলের মধ্যে শুধু এই একটি বাড়ির মালিক তিনি। এদিকে জমি যখন খুব সস্তা ছিল, তাঁর স্বামী অনেক ত্যাগ স্বীকার করে এটা তৈরি করেন। বাড়িও তৈরি হলো, ভদ্রলোকও মারা গেলেন। মেয়ে রোয়েনাকে নিয়ে বিপদেই পড়লেন ভদ্রমহিলা। তবে ওঁদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে, কারণ শহর বেশ বড় হয়ে ওঠায় বাইরে থেকে অনেক লোকজন এদিকে আসছে, থাকার জন্যে তাদের ভাড়া বাড়ি দরকার। সুযোগ পেয়ে নিচতলাটা নিজেদের জন্যে রেখে দোতলাটা তিনি ভাড়া দিয়ে দিলেন। ভাড়ার অঙ্ক খুব বেশি নয়, তবে কষ্ট করে মা-মেয়ের তাতে চলে যাচ্ছে।

তারপর মেয়ে বড় হতে লাগল, সেই সঙ্গে খরচাও বাড়তে শুরু করল। মেয়ের জন্যে নতুন নতুন কাপড় চাই, চাই একটা পিয়ানো। তার লেখাপড়ার খরচও কম নয়। মুশকিল হলো, ভাড়াটে বারো মাস থাকে না। মিসেস কুপার অত্যন্ত হিসেবী মহিলা, টানাটানির মধ্যেও কিছু কিছু সঞ্চয় করেন। সেই সঞ্চয়

দুর্দিনে কাজে লাগে। কিন্তু একটানা যদি এক বছর বাড়ি খালি থাকে, তাহলে তিনি চলবেন কিভাবে?

অথচ ঠিক তাই ঘটছে। শেষ ভাড়াটে চলে যাবার পর আজ এক বছর হয়ে গেল নতুন ভাড়াটে আসছে না। খেয়ে না খেয়ে এতদিন তিনি সংসার চালিয়েছেন, কিন্তু আর তিনি পারছেন না। শুরু হলো বাড়ির ফার্নিচার, দামী ছবি একটা দুটো করে গোপনে বিক্রি। সেগুলোও তো শেষ, এবার তিনি কি করবেন?

মা-মেয়ে বসেছে পরামর্শ করতে। বিক্রি হবে এমন জিনিস বলতে আছে শুধু পিয়ানোটা। ওটাকে বাড়তি আসবাব বলা ঠিক হবে না, কারণ রোয়েনা ওটা রোজই বাজায়। আর দু'দিন বাদেই তো তাকে সমাজে চলাফেরা করতে হবে, গান-বাজনার চর্চা না থাকলে বেচারিকে লজ্জায় পড়তে হবে না? সেই হিসেবে পিয়ানোটা বিক্রি করা চলে না।

কিন্তু বাজনার চেয়ে জরুরী প্রয়োজন খাদ্য। পরনে ভাল কাপড় না থাকলে মেয়ের বাজনাও কেউ শুনতে আগ্রহী হবে না। কাজেই সিদ্ধান্ত হয়েছে, পিয়ানোটা বিক্রি করা হবে। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ও পরে রোয়েনাকে কাঁদতে হয়েছে। রোয়েনার মাও কয়েক রাত ঘুমাতে পারেননি।

কাল হেনরি উডমন্ড এসেছিল। তার দোকানে পুরানো জিনিস-পত্র কেনা-বেচা হয়। কথা হয়েছে, সন্ধ্যার পর এসে পিয়ানোটা নিয়ে যাবে সে। আপাতত ওটা দোকানে রাখা হবে। বিক্রি হলে মিসেস কুপারকে টাকা দিয়ে যাবে, দালালি বাবদ শতকরা বিশ ভাগ কেটে নিয়ে। অগ্রিম দেয়া উডমন্ডের নিয়ম নয়,

তবে মিসেস কুপারের বিশেষ অনুরোধে অল্প কিছু ডলার দিয়ে গেছে সে, পিয়ানো বিক্রি হতে দেরি হলে আরও কিছু দেবে।

আজ সকালে ঘুম ভাঙার পর মা-মেয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে পারছে না। মেয়ের চোখের নিচে পানির শুকনো দাগ। মা মাঝে মাঝেই দীর্ঘশ্বাস চাপছেন। কফি আজ বিষের মত লাগল, কোন মতে গলায় ঢেলে ড্রইংরুমে চলে এল রোয়েনা, বিস্কিটগুলো হাতেই রয়েছে। সাধের পিয়ানোটা শেষবারের মত মন ভরে দেখে নিতে চায় সে। আজ রাতেই তো উডমন্ড এসে নিয়ে চলে যাবে।

মিসেস কুপারও উঠলেন। নিজের ভাগের বিস্কিটগুলো না খেয়ে রেখে দিলেন, কাল রোয়েনাকে দেবেন। ড্রইংরুমে না ঢুকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি, ডাকবাক্সটা দেখবেন। এ-বাড়িতে আজকাল আর চিঠিপত্র আসে না, তবু ডাকবাক্সটা হাতড়াবার অভ্যাসটা তাঁর যায়নি।

পিয়ানোয় ধুলো জমেনি, তারপরও সেটা যত্ন করে ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়ছে রোয়েনা। হঠাৎ শুনতে পেল তার নাম ধরে চিৎকার করছে মা। কোন বিপদ হলো নাকি? ছুটে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল সে। বেরিয়ে দেখল, মা থরথর করে কাঁপছে। ছুটে এসে মাকে ধরে ফেলল সে। 'কি হলো, মা? কি হলো?'

মিসেস কুপারের হাতে দুটো কাগজ। মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু হাসতে না পেরে কেঁদে ফেললেন। 'রু, মা আমার! তোর পিয়ানোটা...'

মায়ের হাত থেকে চিঠিটা নিল রোয়েনা। ভাঁজ খুলে পড়ে

ফেলল এক নিঃশ্বাসে। পড়া শেষ হতে সে-ও মায়ের মত কাঁপতে শুরু করল। দ্বিতীয় কাগজটা কি, ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে তার। তবু সেটা মায়ের হাত থেকে নিয়ে ভাঁজ খুলে চোখ বোলাল। মা দরজার চৌকাঠ ধরে কাঁপছেন, মেয়ে মার্কে ধরে তাল সামলাল। দ্বিতীয় কাগজটা একটা চেক—একশো ডলারের চেক।

চিঠিটা আরেকবার পড়ল রোয়েনা। তারপর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ফিরে এল ড্রইংরুমে। সোফার ওপর বসল মা-মেয়ে, রোয়েনা তৃতীয় বারের মত চিঠিটা পড়ছে।

নিউ ইয়র্ক

১৭ মার্চ, ১৮৫৪

শ্রদ্ধেয়া,

আমরা দুই ভাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে এসেছি। হঠাৎ এক কপি ডসন হেরাল্ড হাতে চলে আসায় আপনার বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। এ-দেশের বড় বড় সব শহরই দেখা শেষ, এবার শান্ত নিরিবিলি কোন গ্রামে বসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ পেলে খুশি হই। ডসন ল্যান্ডিং মিসিসিপির কূলে, আশপাশে গভীর বনভূমিও আছে, তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওখানেই কিছুদিন থাকব। আপনার দোতলাটা ভাড়া নিলাম আমরা। থাকব এক বছর। পঞ্চাশ ডলার ভাড়া ধরেছেন, সেই হিসাবে দু'মাসের ভাড়া একশো ডলার পাঠিয়ে দিলাম। আমাদের স্টীমার বৃহস্পতিবারে ডসন

ল্যান্ডিঙে পৌঁছাবে। আশা করি আপনার কোন অসুবিধে করছি না।

সংক্ষেপে আমাদের পরিচয় অবশ্যই আপনি জানতে চাইবেন। আমাদের বাড়ি ইটালির পিসা শহরের কাছাকাছি। সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত একটি পরিবারে আমাদের জন্ম। লুই ও অ্যাঞ্জেলো, আমরা দুই যমজ ভাই। আমাদের পারিবারিক পদবি–ক্যাপোলো। কাউন্ট ক্যাপোলো আমাদের বাবা। শুধু আমরা দুই ভাই আপনার বাড়িতে থাকব। ধন্যবাদ।

লুই ক্যাপোলো

অ্যাঞ্জেলো ক্যাপোলো।

চেকটায় একটা চুমো খেয়ে রোয়েনা বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! মিরাকল তাহলে সত্যি ঘটে!'

মিসেস কুপার ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। মেয়েকে বললেন, 'তৈরি হয়ে নে, রু। চেকটা ভাঙাতে হবে। ফেরার পথে উডমন্ডকে বলতে হবে সন্ধের সময় তাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। টাকাটাও ফিরিয়ে দেব।'

রোয়েনাকে চিন্তিত দেখাল। 'মা, তুমি বরং একাই যাও। ইটালি থেকে দু'দু'জন কাউন্ট আসছেন বাড়িতে, পুরানো পোশাকগুলো সেলাই-টেলাই করে রাখি আমি। হাতে মাত্র তিন দিন সময়...'

'পুরানো পোশাক বের করার দরকার নেই, রু। ফেরার পথে দরজি উইলিয়ামের দোকানে ঢুকব, তোর জন্যে নতুন একজোড়া পোশাকের অর্ডার দেব। কিছু বেশি টাকা দিলে বুধবার সন্ধের

মধ্যে নিশ্চয়ই ডেলিভারি দিতে রাজি হবে সে।'

'না, মা, দুটো পোশাক আমার দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি বলল রোয়েনা। 'পরার মত তোমারও কিছু আছে নাকি? একটা তোমার হবে, একটা আমার।'

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে উডমন্ডের দোকান, সেখান থেকে উইলিয়ামের দোকান, বেশ অনেকটা পথ আসা-যাওয়া করতে হলো। এই দীর্ঘ সময় মিসেস কুপার কি বোবা হয়ে থাকলেন? তা যদি কেউ ভেবে থাকে, বলতে হবে নারী চরিত্র সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই। তাঁর হাতে গরম একটা খবর রয়েছে না? এমন একটা খবর, গোটা ডসন ল্যান্ডিঙে একা শুধু তাঁরা দু'জন জানেন। এই সুযোগ কি মিসেস কুপার হাতছাড়া করতে পারেন? রাস্তায় যত লোকের সঙ্গে তাদের দেখা হলো, কোন রকম ভূমিকা না করে সবাইকে শুনিয়ে দিলেন তিনি–ইতালির দু'জন কাউন্ট তাঁর বাড়িতে পুরো এক বছর থাকার জন্যে আসছেন। অনেকেই কথাটা বিশ্বাস করল না। তাদের সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তর্ক জুড়ে দিলেন মিসেস কুপার। কেন, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নদী মিসিসিপি নয়? বড় নদীর কূলে যত ছোট শহর আছে, সেগুলোর মধ্যে ডসন ল্যান্ডিং কি সবচেয়ে খুদে শহর নয়? তাছাড়া, ডসন ল্যান্ডিঙে যত ভাড়াবাড়ি আছে, সেগুলোর মধ্যে কুপার লজই কি সবচেয়ে আরামদায়ক নয়? তাহলে? আরে, ইটালি তো ঘরের কাছে। মিসেস কুপারের ভাড়াটে হয়ে কামস্কাটকা থেকে লোকজন এলেও কারও অবাক হওয়া চলে না।

ইটালি থেকে দুজন কাউন্ট আসছেন, খবরটা দু'ঘণ্টার মধ্যে

শহরময় ছড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য সম্ভ্রান্ত তাঁরা, বিশাল ধনী, আভিজাত্যের তুলনা দিতে হলে হারুন-অর-রসিদকে টানাটানি করতে হয়। সেজন্যেই তো কোন রকম দরদাম না করে পঞ্চাশ ডলার ভাড়া দিতে রাজি হয়ে গেছেন! আর শুধু কি রাজি হয়েছেন, দু'মাসের ভাড়া একশো ডলারের চেকও পাঠিয়ে দিয়েছেন! চেকটা যে জাল নয় তার প্রমাণ, এই মুহূর্তে মিসেস কুপারের ব্যাগেই রয়েছে কড়কড়ে একশোটি ডলার। সেই ডলার ডসন ল্যান্ডিঙের প্রায় অর্ধেক বাসিন্দা স্বচক্ষে দেখে ধন্য হয়ে গেল।

দরজি ছাড়ল না, নিজের ও মেয়ের জন্যে দুটো করে চারটে পোশাকের অর্ডার দিলেন মিসেস কুপার। বাড়িতে ফিরে ঝাড়-মোছ করার কাজে কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন তিনি। মিস্ত্রীকে খবর দেয়া হলো, সে কাল এসে দরজা-জানালায় রঙ লাগাবে। ডাইনিং রুমটা নিচতলায়, সেটার দেয়ালে নতুন কাগজ লাগালে দেখতে ভারি সুন্দর হয়। এরকম আরও অনেক কাজ বেরুচ্ছে। সব তিন দিনের মধ্যে সারতে হবে।

তারপর বৃহস্পতিবার এসে গেল। স্টীমার আসবে দুপুরে, কিন্তু সকাল থেকেই নদীর ধারে ভিড় করল মানুষ। ডসন ল্যান্ডিঙে এমন লোক কমই পাওয়া যাবে, যে ইটালির দুই কাউন্টকে দেখতে আসেনি। এমন কি শহরের মেয়রও দুপুরের আগে পৌঁছে গেলেন। তাঁর পিছনেই দাঁড়ালেন মিসেস কুপার, সঙ্গে রোয়েনা।

ছেলেরা শিস দিচ্ছে, মেয়েরা খিলখিল করে হেসে পরস্পরের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে, বুড়োর দল পাইপ ফুঁকছেন ঘন ঘন। বুড়িরা কি করছেন? তাঁরা হাতপাখা নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। এক সময়

দূর দিগন্তে ধোঁয়ার আভাস পাওয়া গেল। ভিড় থেকে গুঞ্জন উঠল, 'ওই আসছে! ওই আসছে!' শুধু শুধু সবাই পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে আরও লম্বা হবার কসরত করছে।

একসময় জেটিতে ভিড়ল স্টীমার। ডবল ডেকে বেজায় ভিড়। মেয়রের তীক্ষ্ণ নজর সেই ভিড়ের ভেতর থেকে খুঁজে বের করল কাউন্টদের। বললেন, 'মিসেস কুপার! ভাল করে দেখুন দেখি,' হাত তুলে দেখালেন তিনি। 'ওরাই বোধহয় আপনার নতুন ভাড়াটে।'

জাহাজ ভর্তি হাজার লোক, তাদের মধ্যে দু'জন যুবক আলাদা করে চেনা সম্ভব নয়। মেয়র হাত তুলে কাদের দেখালেন কে জানে। কিন্তু মিসেস কুপার ঠিকই তাদের চিনতে পারলেন। ভিড়ের মধ্যেও তারা একটু বেশি লম্বা, নাক-চোখে আলাদা বৈশিষ্ট্য, দুই মুখে অদ্ভুত সাদৃশ্য। যমজ যে, দু'জন একই রকম দেখতে হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ডসন শহরের বাসিন্দারা এই মিল দেখেই নিশ্চিত হলো, ওরাই ইটালিয়ান কাউন্ট। দু'জনকে আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছে শুধু পোশাক দেখে। দু'রকম পোশাক না হলে সমস্যাই হত।

জাহাজ থেকে লোকজন নামতে শুরু করল। বিদেশী মেহমানরা সবার পিছনে। বন্দরে এত লোক ভিড় করেছে শুধু তাদের এক নজর দেখার জন্যে, এখনও যেন তারা ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। এক সময় জাহাজ থেকে নেমে এল তারা। তাদের প্রতিটি নড়াচড়া মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে উপস্থিত জনতা। মাঝে মধ্যে শ্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে। অবশ্য

কারও নামে নয়। কারও নাম ধরে শ্লোগান দিলে মেহমানরা তাদেরকে ব্যক্তিত্বহীন ভাবতে পারে।

সবাই বলাবলি করছে, কী আশ্চর্য, তাই না? ডসন ল্যান্ডিঙে কাউন্ট! তা-ও আবার ইটালিয়ান কাউন্ট!

এগিয়ে এসে হাত বাড়ালেন মেয়র। 'শুভেচ্ছা, স্বাগতম! আমার পরিচয়, আমি এই শহরের মেয়র।'

'ও! ধন্যবাদ! এ আমাদের জন্যে বিশাল সম্মান, সত্যি আমরা এতটার যোগ্য নই। আমরা কল্পনাও করিনি...,' কাউন্টদের একজন শুরু করল।

সে থামার আগেই দ্বিতীয় কাউন্ট বলল, 'আমি অ্যাঞ্জেলো ক্যাপোলো, আর ইনি আমার ভাই লুইজি। আমরা যমজ, স্যার।' অ্যাঞ্জেলো হাসতে লাগল।

'যমজ, সে তো দেখেই বোঝা যায়।' লুইজির সঙ্গেও হ্যান্ডশেক করলেন মেয়র। তারপর একটু সরে দাঁড়ালেন, মিসেস কুপারকে যাতে মেহমানরা সরাসরি দেখতে পায়। 'ইনিই মিসেস কুপার, আপনাদের ল্যান্ডলেডি। সঙ্গে ওঁর কন্যা, মিস রোয়েনা কুপার...'

হ্যান্ডশেক করার সময় দুই ভাই বলে চলেছে, 'বিশাল সম্মান! অপ্রত্যাশিত চমক! এই আনন্দের কোন তুলনা হয় না! যেন মনে হচ্ছে বহুকাল পর নিজের দেশে ফিরে এলাম। অচেনা মেহমানদের জন্যে আপনাদের হৃদয়ে এত দরদ আর ভালবাসা, কল্পনা করা যায় না। আমরা আপ্লুত, দিশাহারা! সত্যি আপনারা মহৎ! ডসন বাসীদের এই অভ্যর্থনা কোনদিন ভুলব না। ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!'

মেহমানরা সত্যি অভিভূত। তারা ভাবছে, যেভাবেই হোক এর প্রতিদান দিতে হবে। দু'জন আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত নিল। নিজেদের বাসস্থানে শহরের গণ্যমান্য নাগরিকদের দাওয়াত দিল তারা। আনুষ্ঠানিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সেই সঙ্গে খানাপিনাও হবে।

দু'দিন পরই আলোকমালায় সাজানো হলো মিসেস কুপারের বাড়িটা। মেয়র ও জজ দ্রিস্কল এলেন, আরও এলেন শহরের ব্যবসায়ী মহলের কর্তাব্যক্তিরা। তাদের সবার সঙ্গে পরিচিত হলেন কাউন্ট অ্যাঞ্জেলো আর কাউন্ট লুইজি। আজ বিশ বছর ধরে ডসন ল্যান্ডিঙে বসবাস করছেন 'গুবরে' উইলসন, তাঁর সঙ্গেও ওদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো।

গুবরে উইলসন ডসন ল্যান্ডিঙে এসেছিলেন ওকালতি ব্যবসাটা জমিয়ে তোলার আশা নিয়ে। কিন্তু গত বিশ বছরে একটা মামলাও তাঁর কপালে জোটেনি। লোকজন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, 'গুবরের চলে কিভাবে?'

উইলসনের বাবা কিছু টাকা রেখে মারা গেছেন। সেই টাকা ডসন ল্যান্ডিঙের একটা ব্যাংকে জমা রেখেছেন তিনি। যা সুদ পান তাতে তাঁর চলে না, আসলও মাঝে মধ্যে তুলতে হয়। ফলে সেই জমা টাকাও শেষ হয়ে এসেছে। মামলা তিনি পান না ঠিকই, তবে খাতাপত্র লেখার টুকটাক কাজ অনেকেই তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেয়। ভাগ্যগণনা আর হাতের ছাপ সংগ্রহ করবার নেশাটা আগের মতই আছে তাঁর, এই দুই কাজে কোন রকম ফাঁকি দেন না। এই কাজ তাকে অর্থ দেয় না, তবে জনপ্রিয়তা দিয়েছে। খেয়ালী-

আধপাগলা মানুষ হিসেবে তাঁকে সবাই খুব আদর করে। হস্তরেখাবিদ হিসেবে খানিকটা শ্রদ্ধাও তিনি পান বৈকি।

টম ড্রিস্কলকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাকে কোথাও দেখা গেল না।

টম আজকাল মা জননী অর্থাৎ রক্সির বুদ্ধি-পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করে না। রক্সির যে প্রখর বুদ্ধি, এ-কথা টমও স্বীকার করে। আর রক্সির কথা হলো, সে যদি টমকে রোজগার বাড়াবার পথ দেখাতে পারে, তা থেকে সে-ও আধাআধি বখরা পাবে। ছেলেকে রক্সি বুঝিয়েছে, 'জুয়াটা তোকে ছাড়তে হবে, বাপ। মন লাগিয়ে চুরি-চামারি করতে থাক, তাতেই তোর উন্নতি। বানর হয়ে চাঁদ ধরতে যাবি না—মানিব্যাগ, হাতঘড়ি, দামী খেলনা, এ-সবেই সন্তুষ্ট থাক। এগুলো চুরি করলে ধরা পড়ার ভয় খুব কম। আর যদি ধরা পড়িসও, দু'চার ঘা মেরে ছেড়ে দেবে, থানা-পুলিশের ঝামেলায় যাবে না।'

মায়ের কথায় রাজি হয়ে প্রতি রাতেই চুরি করতে বেরুচ্ছে টম। আগে থেকেই সে জেনে নেয় কোন বন্ধু কখন ঘরে থাকবে না, ঠিক সে-সময় তাদের একজনের ঘরে ঢুকে ছোটখাট দামী জিনিস যা পাওয়া যায় তুলে আনে।

আজ খুব বড় একটা সুযোগ পেয়েছে টম। শহরের গণ্যমান্য লোকেরা কাউন্টদের ভোজসভায় যোগ দিতে গেছেন, ফলে অনেক ঘরই খালি পড়ে আছে, এই সুযোগে এক এক করে সে-সব কামরা থেকে যতটা পারা যায় হাতিয়ে নিচ্ছে টম।

সবগুলো পকেট ভরে যেতে নিজের বাড়িতে ফিরল সে.

নিরাপদ জায়গায় জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখে কাপড় পাল্টাল, তারপর রওনা হলো নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

রোয়েনার পিয়ানোয় তখন সুরের জাদু তৈরি হচ্ছে। সে কি বাজনা! সুরের মূর্ছনা উপস্থিত লোকজনকে একটা ঘোরের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। টম আশ্চর্য হয়ে গেল, ডসন শহরে এত সুন্দর পিয়ানো কে বাজাতে পারে? বাইরে থেকে উঁকি দিয়ে ঘরের ভেতর তাকাল সে। না, ডসন শহরের কেউ নয়, বাজাচ্ছে ইটালিয়ান মেহমানদের একজন।

এটা আরও একটা সুযোগ! মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠল টম। সুরের জাদু সবাইকে যখন মুগ্ধ করে রেখেছে, চুপিচুপি সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল টম। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে এল ওপরে। কাজটা তাকে দু'মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে।

পাঁচ

অতিথিদের বিদায় জানাতে অনেক রাত হয়ে গেল। কাউন্টরা দুই ভাই দোতলায় উঠেই শুয়ে পড়ল। শোয়ার ঘরে চোর ঢুকছিল, বেশ কিছু জিনিস চুরি গেছে, তা তারা খেয়াল করল না।

পরদিন সকালেও ব্যাপারটা ধরা পড়ল না, নাস্তা খেয়েই শহর দেখতে বেরুল তারা। কাল রাতে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়েছে, কেউ কেউ তাদের বাড়িতে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। যদি সম্ভব হয় এই সুযোগে দু'একজনের বাড়িতে যাওয়া হবে।

রাস্তায় প্রথমেই দেখা হলো টম দ্রিঙ্কলের সঙ্গে। ডসন ল্যান্ডিঙে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি জজ দ্রিঙ্কল, এ তারই ভাইপো। কাল রাতে আলাপ ও পরিচয় হয়েছে। অত্যন্ত শৌখিন যুবক। দুই ভাই ভাবছে, তাদের সঙ্গে জমবে ভাল।

টম হাসল। 'বেড়াতে বেরিয়েছেন বুঝি?'

'বেড়ানো, কুশলাদি বিনিময়। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম। একটা কথা জানতে চাই, যদি কিছু মনে না করেন। কাল যাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম, তারা কেউ এদিকে থাকেন কিনা বলতে পারবেন?'

'কেন বলতে পারব না! গুবরে...মানে, মি. উইলসন তো এই কাছেই থাকেন। ওই তো বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। এখুনি যাবেন?'

'হ্যাঁ, এখুনি যেতে অসুবিধে নেই। কাল মি. উইলসনের সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল। কিন্তু–কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলেন আপনি? গুবরে মানে কি? যদি আপত্তি না থাকে তো...'

হেসে ফেলল টম। 'চলুন, হাঁটতে হাঁটতে বলি। ভদ্রলোকের ওটা আসলে ডাকনাম। গুবরের একটা ইতিহাস আছে।'

অ্যাঞ্জেলো তার ভাইকে বলল, 'তোমরা এগোও, আমি ওই দোকানটা থেকে তামাক কিনি। ওদিকের ওই সাদা বাড়িটা তো? তোমাদের পিছু পিছুই আসছি।'

আবার হাঁটা ধরল লুইজি। গুবরে নামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা তাকে শোনাল টম।

সব শোনার পর লুইজি বলল, 'বিশ বছর আগের ঘটনা, আজও মানুষ মনে রেখেছে? আশ্চর্যই বলতে হবে। তা ভদ্রলোক এখন কি করেন? ওকালতি?'

'মক্কেল না পেলে ওকালতি করেন কিভাবে! লোকের হাতের ছাপ সংগ্রহ করা তাঁর একটা নেশা। অনুরোধ করলে হাতও দেখেন। লোকজনকে বলতে শুনি, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী নাকি ফলেও যায়।'

'সত্যি? তাহলে তো গুণী লোক উনি!'

বাড়িটার সামনে এসে নক করল টম। উইলসন বাড়িতেই আছেন। কারা এসেছে জানালা দিয়ে দেখে নিয়ে দরজা খুলে দিলেন। হাসিমুখে লুইজিকে অভ্যর্থনা জানালেন। টমকেও ভেতরে ডাকলেন, তবে সে ডাকে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। উইলসন জানেন টম জুয়াড়ী। সেজন্যেই তাকে তিনি বিশেষ পছন্দ করেন না।

সবাই ড্রইংরুমে বসতে না বসতে টম বলল, 'মি. উইলসন, ডসন ল্যান্ডিঙে এমন একজন লোকও পাওয়া যাবে না যার হাতের ছাপ অন্তত দশবার করে নেননি আপনি। এখন কাউন্টদের ছাপ নিন, কয়েক দিন রেহাই পাই আমরা।'

'আমি ছাপ সংগ্রহ করি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাজে লাগবে এই আশায়। আশা করি মাননীয় কাউন্টরা ছাপ দিতে আপত্তি করবেন না। তবে এখানে বা এখন নয়। ওঁরা বেড়াতে

বেরিয়েছেন, ওদের হাতে কালি মাখাই কি করে!'

লুইজি বলল, 'যেদিন খুশি আমাদের বাড়িতে চলে আসবেন, মি. উইলসন।'

'কিন্তু হাত দেখাতে তো আর কালি মাখানোর দরকার নেই। দেখুন না, মি. উইলসন, ওদের হাতে কি লেখা আছে!' কথাটা বলেই নিজেকে গাধার বাচ্চা বলে গাল দিল টম। এখন যদি উইলসন লুইজির হাত দেখে বলে বসেন যে কাল রাতে টম ড্রিস্কলই তার শোয়ার ঘর থেকে বেশ কিছু জিনিস-পত্র চুরি করেছে? এত ভয় পেল সে, ইচ্ছে হলো ছুটে পালিয়ে যায়।

কিন্তু না! পালালে ওদের মনে সন্দেহ জাগবে।

লুইজি উইলসনকে বলল, 'শুনেছি বটে যে আপনি হাত দেখতে পারেন। তবে সত্যি কথা বলতে কি, আমি কিন্তু এ-সব বিশ্বাস করি না। মানুষের হাত দেখে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলে দেয়া—নাহ্, কি করে তা হয়!'

'হাত দেখা অবৈজ্ঞানিক কোন ব্যাপার নয়,' উইলসন বললেন। 'আপনি বিশ্বাস করেন না? আমি কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস করিয়ে দিতে পারি।'

টম মনে মনে প্রমাদ গুণল।

লুইজি বলল, 'এই নিন আমার হাত। দেখি কিভাবে বিশ্বাস করান।' হাতটা সত্যি সত্যি উইলসনের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

হাতটা টেনে নিয়ে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন উইলসন। ধীরে ধীরে তাঁর হাসিখুশি চেহারা গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠল। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভেঙে ভারী গলায় বললেন, 'বলবার অনুমতি দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল লুইজি।

কপালে ঘাম ফুটছে, শার্টের আস্তিন দিয়ে সেটা মুছছে টম। দরজার দিকে বারবার চোরা চোখে তাকাচ্ছে, প্রয়োজন হলে পালাবে।

উইলসন টমকে বিপদে ফেলার মত কোন কথা বললেন না। স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি বললেন, 'অপরাধ নেবেন না, মাননীয় কাউন্ট। আপনার হাতের রেখায় লেখা রয়েছে, আপনি মানুষ খুন করেছেন।'

টম এমন চমকে উঠল, ঘরে যেন বোমা পড়েছে। লুইজি চমকে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল।

'কী বোকা তুমি! নতুন জায়গায় এসে কেউ হাত দেখায়?' দরজার কাছ থেকে অ্যাঞ্জেলো ক্যাপোলোর গলা শোনা গেল, পাইপে তামাক ভরে এইমাত্র সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে। 'কোন দরকার ছিল নিজের একটা ত্রুটি এভাবে প্রকাশ করার?' উইলসনের দিকে তাকাল। 'শুনুন, মি. উইলসন; শুনুন, মি. দ্রিঙ্কল, আমার ভাই লুইজি একজন মানুষকে সত্যি খুন করেছে, কিন্তু কোন বিচারেই সেটাকে অপরাধ বলা চলে না। আমার জীবন রক্ষার জন্যে একজন আততায়ীকে খুন করতে বাধ্য হয় ও। যদি আগ্রহ থাকে, সব কথা খুলে বলতে রাজি আছি আমি। সত্যি বলছি না মিথ্যে, ইচ্ছে করলেই তা যাচাই করে নিতে পারবেন। কিভাবে? বরোদার মহারাজ গায়কোয়াড়কে টেলিগ্রাম করলেই হবে...'

'গাইকোয়াড়? ভারতবর্ষ, ইন্ডিয়ার মহারাজা...?'

'হ্যাঁ।' সোফায় বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিল অ্যাঞ্জেলো। 'কি হয়েছিল প্রথম থেকেই বলি। আমরা দুই ভাই অনেক দিন ধরেই দুনিয়াটা চষে বেড়াচ্ছি। এমন দেশ কমই আছে যেখানে আমরা যাইনি। ভারতবর্ষে গিয়েছিলাম বছর তিনেক আগে। ওখানে আমাদের মেজবান ছিলেন গাইকোয়াড়ের মহারাজা। ইংল্যান্ডে থাকতে তাঁর সঙ্গে আগেই আমাদের পরিচয় হয়েছিল।

'মহারাজার প্রাসাদে বেশ কয়েকদিন ছিলাম আমরা। প্রাসাদে হাজার রকম দেখার জিনিস, সব আমাদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছেন তিনি। একদিন তাঁর অস্ত্রাগার দেখতে গিয়ে চোখে পড়ল একটা ছোরা। ছোরার হাতল পুরোটাই মূল্যবান রত্নখচিত।'

টম চমকে উঠল! তার ভাগ্য ভাল যে ব্যাপারটা উইলসন বা কাউন্টরা লক্ষ করল না। কিন্তু টমের চমকে ওঠার কারণ কি? কারণ হলো, কাল কাউন্টদের শোয়ার ঘর থেকে যে-সব জিনিস চুরি করেছে সে, সেগুলোর মধ্যে দামী পাথর বসানো একটা ছোরাও আছে। ওগুলো যে দামী পাথর, চুরি করার সময় টম বুঝতে পারেনি। তার ধারণা হয়েছিল, রঙিন কাঁচ ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এখন শুনছে মূল্যবান রত্ন। ভাগ্যিস আজ সকালেই ছোরাটা সে বিক্রি করে দেয়নি।

অ্যাঞ্জেলো বলে চলেছে, 'ছোরাটার দিকে লুইজি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। সেটা লক্ষ করে মহারাজা বললেন, ছোরাটা দেখছি আপনার খুব পছন্দ হয়ে গেছে। ওটা আপনাকে আমি উপহার দিলাম। অতবড় একজন মানুষ, তাঁর উপহার তো আর প্রত্যাখ্যান করা যায় না, কাজেই নিতে হলো লুইজিকে।'

'আমরা যখন অস্ত্রাগারে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমাদের সঙ্গে মহারাজার কয়েকজন দেহরক্ষীও ছিল। মহারাজা বলছিলেন, হাতলটায় যেগুলো ঝকঝক করছে, তার সবগুলোই দামী রত্ন। তাঁর এই কথা দেহরক্ষীদের কেউ নিশ্চয়ই শোনে। ফলে সেই রাতেই আমাদের ঘরে ডাকাত পড়ল।

'প্রাসাদে আমাদের দুই ভাইকে দুটো ঘর দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমরা দু'জন একঘরে শুতে অভ্যস্ত। প্রাসাদেও আমরা পাশাপাশি দুটো খাটে শুচ্ছিলাম। রাত তখন গভীর, যে যার বিছানায় ঘুমাচ্ছি। হঠাৎ কি একটা শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে তাকাতেই আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। আলখেল্লা পরা, মাথায় পাগড়ি, এক লোক আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে, হাতে লম্বা একটা চাকু। এমন ভয় পেয়ে গেলাম যে গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরুল না। কাত হয়ে শুয়ে আছি, হামলা ঠেকানোর জন্যে ভঙ্গিটা সুবিধের নয়। অথচ চাকুটা ক্রমশ আমার গলার দিকে নেমে আসছে।

'পরে রহস্যটা পরিষ্কার হয়। মহারাজের দেহরক্ষীদের অন্তত একজন জানতে পেরেছিল যে লুইজিকে যে ছোরাটা উপহার দেয়া হয়েছে সেটার হাতলে মূল্যবান রত্ন আছে। সেই থেকে তার কোন চর আমাদের দুই ভাইয়ের ওপর কড়া নজর রাখছিল। সেই চর বাবুর্চি হতে পারে, দাস হতে পারে। যাই হোক, সে জানত যে লুইজি ছোরাটা নিজের কাছে রাখেনি। ছোরাটা আমাকে দেয় সে, আমি সেটা বালিশের তলায় রেখে দিই। এই খবর আততায়ী জানত। জানালা খুলে ভেতরে ঢুকেছে সে। আমাকে খুন করে

ছোরাটা নিয়ে পালাতে পারলেই ধনী হয়ে যাবে। কাজেই লোভটা সামলাতে পারেনি।

'যাই হোক, ছোরার ফলা আমার গলা ছুঁয়েছে, এই সময় আততায়ীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল লুইজি। আততায়ীর পিঠের ওপর দিয়ে ছোরাসহ তার ডান হাতটা চেপে ধরল সে। খানিকটা ধস্তাধস্তি হলো। অবশেষে আততায়ীর হাত থেকে খসে পড়ল ছোরা। সেটা তুলে নিয়ে তারই বুকে গেঁথে দিল লুইজি।

'খবর পেয়ে সেই রাতেই ছুটে এলেন মহারাজা। দেহরক্ষীর লাশে গুনে গুনে তিনটে লাথি মারলেন তিনি, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "নিজের বিশ্বস্ত লোকজনের ভেতর এমন লোভী কেউ আছে, এ আমার জানা ছিল না। আপনাদের একটা কিছু হয়ে গেলে সারাজীবন অপরাধবোধে ভুগতাম"।

'পরদিনই বরোদা ছাড়লাম আমরা। এই হলো লুইজির মানুষ খুন করার কাহিনী। এখন আপনারাই বলুন, ঈশ্বর বা মানুষ, কেউ কি ওকে অপরাধী বলবে?'

মানুষের একটা অদ্ভুত স্বভাব হলো, একবার যার ক্ষতি করেছে, আবার তার ক্ষতি করতে চায়। টম দ্রিস্কলও এই স্বভাবের দাস। কাউন্টদের ঘরে চুরি করে বেশ অনেক জিনিস পেয়েছে সে, কিন্তু তাতেও তার মন ভরল না, এখন সে সুযোগ খুঁজছে কিভাবে আরও ক্ষতি করা যায় তাদের।

খুঁজলে সুযোগ পাওয়া যায়।

ডসন ল্যান্ডিঙে নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করল। বর্তমান

মেয়র অবসর নিচ্ছেন, তাঁর পদে নির্বাচিত হবার জন্যে একাধিক প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের মধ্যে গুবরে উইলসনও আছেন।

শুনতে কেমন যেন লাগে! যে শহরের ভোটাররা গত বিশ বছরে যাকে একটা মামলাও দেয়নি, তারা তাঁকে মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে উৎসাহ দেবে কেন? এর একটা ব্যাখ্যা তো অবশ্যই আছে। এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে ডসন ল্যান্ডিঙের ছেলে-বুড়ো সবাই উইলসনকে সত্যি খুব পছন্দ করে। ব্যঙ্গাত্মক ছড়া কেটে, 'গুবরে' নাম রেখে কম অপমান করা হয়নি তাঁকে। কিন্তু এই অপমান তিনি কখনও গায়ে মাখেননি। এত অত্যাচার করা হয়েছে, অথচ বিশ বছরে কেউ তাঁকে একটিবারও মেজাজ খারাপ করতে দেখেনি। ছেলেরা দলবেঁধে ছড়া কাটলে, হাততালি দিলে, মন খারাপ করেননি তিনি, বরং তাদের দিকে তাকিয়ে হেসেছেন। গুবরে বলে কেউ ডাকলে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছেন। এত নরম একজন মানুষকে ভাল না বেসে পারা যায়?

হ্যাঁ, উইলসন দরিদ্র মানুষ। কিন্তু দরিদ্র হলেও কারও কাছে কখনও তিনি হাত পাতেন না। তাছাড়া, কাজের ব্যাপারে তাঁর কোন বাছবিচার নেই। যা পান তাই করেন। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের খাতা লেখা থেকে শুরু করে বনভূমির সীমানা জরিপ, সব কাজই তাঁকে করতে দেখা গেছে।

কিভাবে যেন একদল কর্মী জুটে গেল। তারাই মিছিল-মীটিং ডাকছে, শ্লোগান দিচ্ছে, দেয়ালে দেয়ালে চিকা মারছে।

টাকা? তা-ও নিজেরাই চাঁদা তুলে যোগাড় করেছে। প্রতিটি জনসভায় গুবরে উইলসনের গুণকীর্তন করা হচ্ছে, শুনে উইলসন নিজেই বিস্ময়ে হতভম্ব। সারা শহর 'ভোট ফর উইলসন' শ্লোগানে মুখর হয়ে উঠল। মিছিল থেকে বলা হচ্ছে, 'আগামী মেয়র হিসেবে গুবরে উইলসনকে দেখতে চাই আমরা।' যারা শ্লোগান দিচ্ছে তাদের সঙ্গে ইটালি থেকে আশা কাউন্টরাও রয়েছে।

উইলসনের গুণে তারাও মুগ্ধ।

সাধারণ মানুষের প্রতি এই ভদ্রলোকের মমত্ববোধ তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। আপনভোলা, উদারহৃদয় উইলসন বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে মেতে থাকেন, এটাও তাদের খুব ভাল লেগেছে। উইলসনের কোন বদ নেশা নেই। তার কোন শত্রুও নেই।

জুয়াড়ী, চোর, মিথ্যুক, প্রতারক, এরকম আরও অনেক কিছু বলা যায় টম ড্রিস্কলকে; এমন কি সে-ও গুবরে উইলসনের বিরুদ্ধে নয়। বরং সুযোগ দেয়া হলে উইলসনের পক্ষে দু'চার কথা বলতেও রাজি আছে সে। আর এই নিয়েই গোলমালটা বাধল।

সেদিন রাস্তার পাশেই জনসভা ডাকা হয়েছে। উইলসনের পক্ষে লুইজি ক্যাপোলো বক্তৃতা দিচ্ছে। দীর্ঘ বক্তৃতা, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে টম ড্রিস্কলও তা শুনছে। লুইজির বক্তব্য তার অপছন্দ নয়, কিন্তু তবু সে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। কারণ বক্তব্য অপছন্দ না হলেও, বক্তাকে তার পছন্দ নয়। হ্যাঁ, লুইজি ক্যাপোলোকে সহ্য করতে পারছে না টম। তার অবশ্য কারণও আছে।

লুইজিকে শত্রু বলে মনে করছে টম। কেন? কারণ, চুরি যাওয়া ছোরাটার কথা পুলিশকে বলে দিয়েছে লুইজি। ভোজসভার

রাতে কাউন্টদের ঘর থেকে কিছু নগদ টাকাও চুরি করেছিল টম, সেগুলো খরচ করতে কোন সমস্যা হয়নি। আরও চুরি করেছিল একটা সোনার ঘড়ি ও কয়েকটা সোনার বোতাম। ইহুদি স্যামুয়েলের কাছে সেগুলো বিক্রি করে দিয়েছে সে, তাতেও কোন সমস্যা হয়নি। সমস্যা দেখা দিয়েছে ছোরাটাকে নিয়ে। পুলিশকে ছোরার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেই থেকে শহরের সব ক'টা দোকানের ওপর নজর রাখছে তারা। কাজেই শুধু স্যামুয়েল নয়, এ শহরে চোরাই জিনিসের ব্যবসা যারা করে তারা কেউই ছোরাটা কিনতে সাহস পাবে না।

অবশ্য একেবারে সস্তায় বিক্রি করতে চাইলে খদ্দের পাওয়া কঠিন হবে না। কিন্তু ছোরাটার হাতলে মূল্যবান রত্ন আছে জানার পর লোভী হয়ে উঠেছে টম। তার আশা, ছোরাটা বিক্রি করে ভাল একটা পুঁজি যোগাড় করবে সে। অন্তত দশ হাজার ডলারের কমে ছাড়বে না।

তার এই দশ হাজার ডলার পাবার পথে বাধা দিয়েছে লুইজি ক্যাপোলো। কাজেই লুইজি টমের শত্রু নয় তো কি? ইটালিয়ান ওই কাউন্টকে এখন সে অন্তর থেকে ঘৃণা করে।

তাই লুইজি যখন বক্তৃতা দিচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে তাকে ভেঙচি কাটছে টম। জনসভায় যারা এসেছে তারা ওই ভেঙচি কাটা দেখছে। মুখে কিছু বলছে না কেউ, তবে টমের ওপর মনে মনে খেপছে সবাই।

তারপর এক সময় লুইজির বক্তৃতা শেষ হলো। এতক্ষণ ভেঙচি কেটে সন্তুষ্ট ছিল টম, নিজের কিসে ভাল জানা থাকলে

এখানেই থামত সে। কিন্তু থামল না, মুখ খুলে বেফাঁস একটা কথা বলে ফেলল।

টম কি জনসভায় উপস্থিত লোগুলোকে ভুল বুঝেছে? সে ভেঙচি কাটছে, সবাই দেখছে, অথচ কেউ কিছু বলছে না; এটা দেখে তার ধারণা হয়েছে, লুইজির বক্তৃতা কারও ভাল লাগছে না। তার এরকম চিন্তা করার পিছনে অবশ্য একটা কারণ আছে। বক্তৃতা ভাল হলে শ্রোতারা ঘন ঘন তালি দেয়, প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে। অথচ লুইজির বক্তৃতার সময় কেউ তালিও দেয়নি, প্রশংসাও করেনি।

বক্তা বিদেশী, আমেরিকান ইংরেজি ভাল জানা থাকলেও বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত নয়, মাঝে মধ্যেই হোঁচট খাচ্ছে-এই অবস্থায় হাততালি বা প্রশংসা তার মনোসংযোগে বিঘ্ন ঘটাবে, হারিয়ে যাবে কথার খেই। শ্রোতারা সেটা চায়নি।

টম তাদেরকে ভুল বুঝল। সে ভাবল, ভেঙচি কাটার জন্যে সবাই বোধহয় মনে মনে তার প্রশংসা করছে। আর তাই প্রবল উৎসাহে সে বলে বসল, 'ছি-ছি, কী জঘন্য! ইটালিয়ানটার দেখছি লজ্জা-শরমের বালাই নেই। যারা নিজের দেশে স্বাধীন নয়, কোন্ সাহসে তারা যুক্তরাষ্ট্রে এসে স্বাধীনতার বুলি কপচায়?'

বক্তৃতায় লুইজি বলেছে, প্রত্যেক দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য হলো স্বাধীনভাবে ভোট দেয়া। সেটা নিয়েই খোঁচা মারল টম। খোঁচাটা যদি ভদ্র ভাষায় মারত, কারও কিছু বলবার ছিল না। কিন্তু তার ভাষা ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। স্বভাবতই লুইজির ব্যক্তিত্বে ব্যাপারটা আঘাত করল। হোক বিদেশ, এভাবে সরাসরি

অপমান করা হলে সে সহ্য করবে কেন? মারমুখো হয়ে ছুটে এল সে। বলল, 'তুমি আমাকে অপমান করেছ! ভাল চাও তো এখুনি ক্ষমা চাও।'

সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কখনোই কারও সঙ্গে মারামারি করে জিততে পারেনি টম। তেড়ে আসা লুইজির সঙ্গে কি লড়তে পারবে সে? ছেলেবেলার অভ্যাস, ঘাড় ফিরিয়ে সে বলতে গেল, 'চেম্বার! মার তো!' কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল, এখন আর চেম্বার তার পাশে ছায়ার মত ঘোরে না। মারমুখো লুইজির সামনে অসহায়বোধ করল টম। উপায় না দেখে ক্ষমাই চাইতে যাচ্ছিল। কিন্তু লোকজনের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন চমকে উঠল সে। দর্শক ও শ্রোতারা তার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কেন? পরিস্থিতি দেখে টমের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। 'আমি দুঃখিত,' এই কথাটা আর বলা হলো না। ঘুরে দাঁড়িয়ে কেটে পড়ার তাল করল সে। তবে ভাব দেখাচ্ছে, ছোটলোক ইটালিয়ানটার কথার জবাব দিতে ঘৃণাবোধ করছে সে।

কিন্তু ভাগ্য আজ টমের পক্ষে নয়। সে পিছন ফিরতেই তার পিঠে প্রচণ্ড এক লাথি কষল লুইজি। ছিটকে পড়েই যাচ্ছিল টম, তবে না, দর্শকরা তাকে ধরে ফেলল। সেই ধরা কি সুসংবাদ? এর জবাব অনেক কঠিন মূল্য দিয়ে পেতে হলো টমকে। শ্রোতারা তো সবাই এই ডসন শহরেই বাস করে, জুয়াড়ী হিসেবে খুব ভাল করেই চেনে টমকে। শহরের কেউই তাকে ভাল চোখে দেখে না। তারা ধরল, ধরার পর আর ছাড়ল না। সবাই মিলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল টমকে। নিচে পড়ল টম, কিন্তু মাটিতে নয়, আরেক দল

লোকের বাড়ানো হাতে। এভাবেই তাকে ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয়ে গেল। একদল ছুঁড়ে দেয়, আরেক দল লুফে নেয়। এভাবে হাতবদল হতে হতে ভিড়ের বাইরে, রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হলো টম। ভীরু আর কাপুরুষ বলে সবাই তাকে গাল দিচ্ছে।

ছয়

যুক্তরাষ্ট্রের ভদ্রসমাজে অনেক রীতিনীতিই অত্যন্ত উগ্র ও হিংস্র, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে। কেউ কাউকে অপমান করলে বা কারও সঙ্গে কারও মারামারি বাধলে পরস্পরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করাই প্রচলিত নিয়ম। তা যদি কেউ না করে, তাকে অভদ্র ও কাপুরুষ বলে মনে করা হয়।

লুইজি ক্যাপোলোর লাথি খেলো টম দ্রিস্কল, কাজেই সবাই আশা করল লুইজিকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জ করবে সে।

দ্বন্দ্বযুদ্ধে তলোয়ার বা পিস্তল ব্যবহার করা হয়। দুটোর একটাতেও টম দক্ষ নয়। তাছাড়া, লোকে আশা করলে কি হবে, টম তো আর সত্যি সত্যি ভদ্রলোক নয়। কাপুরুষতা যার মজ্জার সঙ্গে মিশে আছে, লড়াই করার সাহস সে পাবে কোত্থেকে? প্রাণ হারাবার ভয়ে পিছিয়ে গেল টম। ভদ্রসমাজের নিয়ম-নীতি রক্ষা

করতে রাজি হলো না। তবে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে প্রতিশোধ গ্রহণের অন্য একটা উপায় বের করল সে। ছোটলোকের মত আদালতে গিয়ে লুইজির নামে মামলা ঠুকে দিল। লিখিত অভিযোগে জানাল, লুইজি তাকে লাথি মেরেছে।

ডসন ল্যান্ডিঙের লোকেরা টমকে ছি-ছি করতে লাগল, এমন কি বিচারক নিজেও সকলের অগোচরে বিতৃষ্ণায় নাক কোঁচকালেন। তবে অভিযোগ যখন করা হয়েছে, সেটাকে অগ্রাহ্য করবারও উপায় নেই। দেশে আইন আছে না? যারা আইন ভাঙবে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যেই তো আদালত। স্বাধীন একজন নাগরিককে লাথি মেরে লুইজি ক্যাপোলো আইন ভেঙেছে, কাজেই তার বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচার হবে। বিচারপতি রিচার্ডসন লুইজির ওপর সমন জারি করার নির্দেশ দিলেন।

বাধ্য হয়ে আদালতে আসতে হলো লুইজিকে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে একজন উকিল নিয়োগ করা নিয়ম, সে নিয়মও তাকে রক্ষা করতে হলো। ক্যাপোলোরা ডসন ল্যান্ডিঙে নতুন এসেছে, এখানকার মাত্র একজন উকিলকেই তারা চেনে। তাঁর নাম গুবরে উইলসন। গুবরে উইলসন এমন একজন উকিল, যিনি গত বিশ বছরে একটা মামলাও লড়েননি। এমন কি আদালতেও কখনও তাঁকে দেখা যায়নি।

লুইজির উকিল উইলসন? টম তো হেসেই খুন। শহরের লোকজন অবশ্য তার মত হাসল না বটে, তবে বেজায় কৌতূহলী হয়ে উঠল।

আজ থেকে বিশ বছর আগে উইলসন যে ওকালতি করতেই

ডসন ল্যান্ডিঙে এসেছিলেন, সে-কথা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের মধ্যেও খুব কম লোক মনে রেখেছেন। যুবকরা এ-ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানে না। দীর্ঘ বহু বছর ধরে সবাই দেখে আসছে শহরবাসীর হাতের ছাপ নেয়াটাই রোজকার নিয়মিত কাজ তাঁর, বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলে নিজের অফিসঘরে বসে এক-আধজনের হাতও দেখেন। সেই উইলসন লুইজির মামলা লড়বে? সবার মনেই সংশয় ও দ্বিধা।

এ নিয়ে উইলসনের মনে অবশ্য এতটুকু দুশ্চিন্তা নেই। এতদিন আদালতে হাজির হয়ে হাকিম সাহেবকে আইন ব্যাখ্যা করে শোনাবার সুযোগ তিনি পাননি বটে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। ওকালতি পাস করেছেন তিনি, আইন সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনা আছে। সবচেয়ে জরুরী যে জিনিসটা দরকার, আত্মবিশ্বাস, সেটারও তার কোন অভাব নেই। নির্দিষ্ট দিনে সুটেডবুটেড হয়েই আদালতে হাজির হলেন তিনি।

সাক্ষীরা সংখ্যায় অগুনতি। বক্তৃতায় লুইজি ক্যাপোলো একটাও মিথ্যে কথা বলেননি বা কোন ভুল তথ্য দেননি। তাসত্ত্বেও টম দ্রিস্কল তাঁকে "লজ্জা-শরমের বালাই নেই" বলে গালমন্দ করেছে। মারধর? হ্যাঁ, টম দ্রিস্কলের নিতম্বে লুইজি ক্যাপোলো লাথি একটা মেরেছেন বটে। কিন্তু কেন মারলেন, সেটাও ভেবে দেখতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, লাথিটা না মেরে তাঁর উপায় ছিল না। কাউকে অপমান করা আইনবিরুদ্ধ কাজ। অপমান মুখ বুজে সহ্য করাও সম্ভব নয়। টম দ্রিস্কল লুইজিকে অপমান করেছে, ফলে তাকে মার খেতে হবে না?

তাছাড়া, টম দ্রিস্কল শুধু লুইজিকে অপমান করেনি, অপমান করেছে গোটা ইটালি জাতিকে। সে বলেছে, ইটালিয়ানরা স্বাধীন নয়।

উইলসনের বক্তব্য শেষ হতে টম দ্রিস্কলের উকিল উঠে দাঁড়ালেন। 'টম দ্রিস্কল তো সত্যি কথাই বলেছেন! সবাই জানে, ইটালির অনেক অংশ এখনও পরাধীন রয়ে গেছে।'

গুবরে উইলসন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন। 'কোন সম্মানী ব্যক্তিকে অপমান করবার জন্যে রাজনৈতিক পরাধীনতার কথা তোলার আইনসঙ্গত বা নৈতিক অধিকার কারও থাকতে পারে না। কারণটাও স্পষ্ট–রাজনৈতিক পরাধীনতা বা স্বাধীনতা কোন ব্যক্তির একক চেষ্টা কিংবা কৃতিত্বের ওপর নির্ভর করে না। তিনি যদি পরাধীন হনও, সেটা তাঁর ত্রুটি বা ব্যর্থতা বলে গণ্য করা যাবে না। তাছাড়া, দেখুন, আমরা এই যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরাও মাত্র কিছুদিন আগে পরাধীন ছিলাম, অর্থাৎ আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। সেই স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি যুদ্ধ করে। ওই একই যুদ্ধ ইটালিতেও চলছে। আমার প্রশ্ন হলো, এক্ষেত্রে একজন বিবেচক ভদ্রলোকের কর্তব্য কি হওয়া উচিত? আমার বিবেচনায়, ইটালিতে যে যুদ্ধটা হচ্ছে তার প্রতি সহানুভূতি পোষণ করা উচিত। মুখ ফুটে কিছু যদি বলতেই হয়, এই সহানুভূতির কথাই বলতে হবে, সেই যুদ্ধ বা যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অপমানজনক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা যাবে না।'

সবাই স্বীকার করল, উইলসনের বক্তব্য অত্যন্ত জোরাল হয়েছে। আদালতে তিলধারণের জায়গা নেই, বাইরেও দীর্ঘ সময়

ধরে অপেক্ষা করছে বহু লোকজন। লুইজি ক্যাপোলো বনাম টম দ্রিস্কলের মামলায় বিচারক কি রায় দেন শোনার জন্যে সবাই ব্যাকুল।

টমের চাচা জজ দ্রিস্কল শহরে নেই। তিনি থাকলে মামলাটা আরও জমত।

এতদিনে ডসন বাসীরা নিজেদের ভুলটা উপলব্ধি করতে পারল। উইলসন এত সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন? কি তাঁর বাচনভঙ্গি! কি তাঁর আত্মবিশ্বাস! এত দক্ষ একজন উকিল অথচ তাঁকেই কিনা তারা বিশ বছর ধরে একটা মামলাও করতে দেয়নি? অনেকেই নিজেদের সমালোচনা করতে লাগল।

জোরাল বক্তব্য দেয়ায় উইলসনের একটা অন্তত লাভ হলো। ওকালতিতে পসার জমাবেন, সে-বয়স সম্ভবত এখন আর তাঁর নেই। তবে যে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন, তাতে তাঁকে পরাজিত করা খুব কঠিন হবে। শহরের লোকজন বেশিরভাগই তাঁর পক্ষে ছিল, এখন তাঁর বিপক্ষে প্রায় কেউই থাকবে না। ধরে নেয়া চলে, পরবর্তী মেয়র তিনিই হবেন।

এবার রায় দেয়ার পালা। বিচারক রিচার্ডসন বললেন, 'কোন সন্দেহ নেই, লুইজি ক্যাপোলো একটা অপরাধ করেছেন। তবে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়ে গেছে যে তাঁকে অপমান করাতেই রাগের বশে অপরাধটা করে ফেলেছেন তিনি। কাজেই আইনের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে বাধ্য হয়ে আমি তাঁকে দণ্ড দিচ্ছি। আবার, তাঁর রেগে ওঠার পিছনে সঙ্গত কারণ থাকায় সকল দিক বিবেচনা করে যথাসম্ভব লঘুদণ্ড দেওয়াই কর্তব্য বলে মনে করছি।'

মাত্র পাঁচ ডলার জরিমানা হলো লুইজি ক্যাপোলোর। শালীনতা ও সভ্যতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে টম দ্রিস্কল, লুইজি ক্যাপোলো নয়–সে-কথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করেছেন বিচারক, কাজেই এই রায়ে সবাই সন্তুষ্ট হলো।

এই মামলার পর টম একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়ল। মামলায় জিতলে কি হবে, শহরে কোথাও মুখ দেখাতে পারছে না সে। তাকে দেখলেই লোকে হাসাহাসি করে। সত্যিকার বন্ধু-বান্ধব তার অবশ্য নেই, কিন্তু চেনা-জানা লোক তো কম নয়, তারাও তাকে দেখামাত্র মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটল জজ দ্রিস্কল শহরে ফেরার পর। ঘটনাচক্রে মামলার সময় তিনি শহরে ছিলেন না, তাঁরই মত একদল বুড়োর সঙ্গে গিয়েছিলেন ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে। পনেরো দিন পর ফিরলেন তিনি। ভাইপো কি করেছে, মামলার রায়, ইত্যাদি সমস্ত কথা শুনে তাঁর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। কী, এত বড় স্পর্ধা? কোথাকার কোন এক বিদেশী, কাউন্ট হোক বা প্রিন্স, প্রকাশ্য জনসভায় দ্রিস্কল বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারকে লাথি মারল? কাউন্ট? যুক্তরাষ্ট্র সমানাধিকারের দেশ, এখানে ওসব মান্ধাতা আমলের বাতিল উপাধির মূল্য কি? আর ডসনবাসীরাই বা কেমন? একজন বিদেশী লোক সম্ভ্রান্ত দ্রিস্কল পরিবারের সদস্যকে লাথি মারল, তারা তার ঘাড় না মটকে উল্টে কিনা প্রশংসা করছে?

তবে জজসাহেবের আসল রাগ ভাইপোর ওপর। গোটা ব্যাপারটা তাঁর এতটা অসহ্য লাগত না, ভাইপো যদি দ্রিস্কল

বংশের মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টা করত। তাঁর বিবেচনায়, টম ভদ্রলোকের মত আচরণ করেনি। দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা এরকম অপমানের প্রতিকার হিসেবে একটা উপায়ই বেছে নেয়, প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আহ্বান জানায়। কারণ, শুধু রক্তপাতই এই অপমান ধুয়ে-মুছে ফেলতে পারে। রক্ত কার ঝরল, সেটা কোন ব্যাপার নয়। দ্বন্দ্বযুদ্ধে যে পক্ষই মারা যাক, দু'পক্ষই যার যার সম্মান ফিরে পাবে। তাছাড়া, একপক্ষকে মরতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। আসল কথা রক্ত! যত সামান্যই হোক, রক্ত ঝরা চাই। গোটা দক্ষিণাঞ্চলে এটাই হলো রীতি। ভদ্রসমাজে এ রীতি অবশ্য পালনীয়।

দ্রিস্কল পরিবারকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত হিসেবে তাদের খ্যাতি আছে। সংকটের সময় অবশ্য পালনীয় রীতিটা তারা মেনে চলবে না, তা কি হয়? এ তো জজ দ্রিস্কল কল্পনা করতেও পারেন না!

অথচ সেই কল্পনাতীত ব্যাপারই ঘটে গেছে। তাঁর মায়ের পেটের ভাইয়ের রক্তে যার জন্ম, যে কিনা দ্রিস্কল বংশের একমাত্র বংশধর, সেই টম দ্রিস্কল কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে, প্রাণ হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে লংঘন করেছে ভদ্রসমাজের অবশ্য পালনীয় রীতিটা। জনসভার মাঝখানে, হাজারও লোকের সামনে, লাথি খেয়েছে নিতম্বে, অথচ অপমানকারীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেনি। ছি-ছি, এখন তিনি ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবেন কিভাবে।

দ্রিস্কল বংশে এমন কাপুরুষ কিভাবে জন্ম নিল ভেবে পাচ্ছেন না জজসাহেব। ছোট ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতেও ভেঙে পড়েননি

তিনি। কিন্তু তাঁর ছেলের কাপুরুষোচিত আচরণ তাকে রীতিমত অসুস্থ করে তুলল। শহরে ফেরার পর সেই যে তিনি বাড়ির ভেতর ঢুকেছেন, তারপর আর লজ্জায় বেরুতেই পারছেন না। রাস্তায় না বেরিয়েও তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন, লোকজন তাঁকে আর তার ভাইপোকে নিয়ে হাসাহাসি করছে।

কিন্তু মুখ লুকিয়ে কতদিন বাড়ির ভেতর থাকা যায়? তিনি অবসর নিলেও, আরও তো কাজকর্ম আছে। প্রচুর সয়সম্পত্তি তাঁর, জায়গা-জমি আর বাদী-দাসীও কম নয়, কাজেই অনেক বিষয়েই তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়, এখানে সেখানে যেতে হয়। তাঁর মত মানুষের লুকিয়ে থাকলে চলে না।

এখন তাহলে কি করবেন তিনি? অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায়ই দেখতে পেলেন জজ দ্রিস্কল। প্রাণভয়ে যে কাজ টম করতে পারেনি, এই বুড়ো বয়সে তাঁকেই সেই কাজটা করতে হবে। শুধু তাহলেই যদি দ্রিস্কল পরিবার আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। হ্যাঁ, হারানো গৌরব ফিরে পাবার এটাই একমাত্র উপায়। লুইজি ক্যাপোলোকে তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাবেন।

শহরের লোকজন হাসাহাসি করছে, তাদের হাসি থামিয়ে দেবেন তিনি। তারা বুঝবে, বংশে একজন কাপুরুষ জন্মেছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে দ্রিস্কলদের সবাইকে ছোটলোক ভাবার কোন কারণ নেই।

বন্ধু হাওয়ার্ডকে ডেকে সব কথা খুলে বললেন জজ দ্রিস্কল। হাওয়ার্ড তাঁর বার্তা নিয়ে ছুটলেন লুইজি ক্যাপোলোর কাছে। ভাইপোকে অপমান করার কারণে বৃদ্ধ জজ দ্রিস্কল দ্বন্দ্বযুদ্ধে

আহ্বান করেছেন লুইজি ক্যাপোলোকে। ভাইপো নিজে অজ্ঞাত কোন বিশেষ কারণে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি, তা ঠিক, কিন্তু তার বদলে চাচা ডুয়েল লড়তে প্রস্তুত। নিজের বদলে প্রতিনিধিকে দিয়ে যুদ্ধ করাবার রেওয়াজ তো চালুই আছে, তাই না?

চ্যালেঞ্জ পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ল লুইজি। তারপর তার রাগ হলো। ছি-ছি, একি কাণ্ড। শেষ পর্যন্ত তাকে বাপের বয়সী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ডুয়েল লড়তে হবে? এ কি মুসিবত! বুলেট যদি জজ সাহেবের গায়ে লেগে যায়? লেগে যায় মানে কি, অবশ্যই লাগবে! কারণ রাইফেল হোক পিস্তল হোক, যে-কোন খুদে আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে ইটালিয়ানরা অত্যন্ত দক্ষ। তাদের লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না। আর ক্যাপোলো ভাইদের তো এ-ব্যাপারে রীতিমত খ্যাতি আছে।

জজ দ্রিস্কলের বুলেট লুইজির গায়ে লাগতে পারে, আবার না-ও লাগতে পারে। কিন্তু লুইজি লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না। এ-ব্যাপারে দুই ভাইয়ের মনে কোন সন্দেহ নেই।

এ অত্যন্ত জটিল সংকট। শুধু বংশমর্যাদা রক্ষার স্বার্থে বৃদ্ধ জজসাহেব আত্মঘাতী হতে চাইছেন। লুইজি কি করে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়? দুই ভাই অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ করল। সিদ্ধান্ত হলো, বৃদ্ধ দ্রিস্কলের শরীর লক্ষ্য করে গুলি চালানো উচিত হবে না। চ্যালেঞ্জ যখন করা হয়েছে, লুইজিকে ডুয়েল লড়তেই হবে। লড়বে সে। গুলিও করবে। তবে দেখেশুনে।

ডুয়েলের তারিখ স্থির হয়ে গেল।

নিজের বিষয়-সম্পত্তি বিলি-ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন

জজসাহেব। প্রথমেই চিন্তা করতে হলো, অপদার্থ টম দ্রিঙ্কল সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নেয়া যায়। শহরে ফিরে টমের কুকীর্তি শোনার পর উইল ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন তিনি, তৈরি করেছেন নতুন উইল। নতুন উইলে টমকে কিছুই দেয়া হয়নি। কিন্তু ডুয়েলের তারিখ স্থির হবার পর তাঁর চিন্তা-ভাবনায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে।

জজ দ্রিঙ্কল এখন ভাবছেন, টমকে তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করাটা নিষ্ঠুরতা হয়ে যায়। সন্দেহ নেই, সে কাপুরুষ। এ-ও ঠিক যে বংশের মুখে চুন-কালি মাখিয়েছে। কিন্তু টম ছাড়া দ্রিঙ্কল বংশের প্রতিনিধি বলতে আর কেউ নেইও। সেই তাদের একমাত্র জীবিত বংশধর। তাঁর আপন ভাই পার্সির সন্তান। টমের বাবা মৃত্যুর আগে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন, ছেলের জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারেননি। তখন বড় ভাই জজ দ্রিঙ্কল ছোট ভাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, টম বাবার টাকা-পয়সা না পেয়েছে তো কি হয়েছে, চাচার সয়-সম্পত্তি অবশ্যই পাবে। বলেছিলেন, টম কোনদিনই অর্থকষ্টে ভুগবে না। বড় ভাইয়ের সেই আশ্বাস পেয়ে শান্তিতেই মারা গিয়েছিলেন পার্সি দ্রিঙ্কল।

আজ যদি জজ দ্রিঙ্কল টমকে বঞ্চিত করেন, সেই প্রতিশ্রুতি কি ভঙ্গ করা হবে না? মুমূর্ষুকে দেয়া প্রতিশ্রুতি, এরচেয়ে পবিত্র আর কিছু হতে পারে না।

টমকে বঞ্চিত করা হলে তার ফল হবে এই যে ছেলেটা সারাজীবন কষ্ট পাবে। তার তো সে মুরোদ নেই যে নিজের পেট নিজে চালাবে। সৎ পথে একটা পয়সাও সে রোজগার করতে

পারবে না। টাকার অভাবে শুধু যে কষ্ট পাবে তা নয়, দিনে দিনে তার আরও অধপতনও ঘটবে। শেষ পর্যন্ত তাকে ধরা পড়ে জেলও খাটতে হবে। প্রথম জীবনেই জুয়াড়ী হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছে, মধ্যজীবনে নাম কিনবে চোর-ডাকাত হিসেবে, আর শেষ জীবনে হবে কয়েদী। তাতে দ্রিস্কল পরিবারের গৌরব বাড়বে না কমবে?

বংশের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে বুড়ো বয়েসে ডুয়েল লড়তে যাচ্ছেন তিনি। সেই মর্যাদা যাতে অটুট থাকে, সে ব্যবস্থাও তাঁকে করে যেতে হবে। সে ব্যবস্থা হয় টমকে নিজের টাকা ও সম্পত্তি দান করে গেলে। তাতে অবশ্য ধরে নেয়া ঠিক হবে না যে টম সৎ হয়ে চলবে। ক্ষীণ একটু সম্ভাবনাই শুধু থাকবে। কিন্তু সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করা হলে টমের সৎ হয়ে বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

মাত্র দু'দিন আগে নতুন উইল লিখিয়েছেন জজসাহেব, সেটাও আজ ছিঁড়ে ফেললেন। আবার নতুন করে লেখাতে হবে।

উইলটা তিনি ছিঁড়ছেন, ঠিক এই সময় দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল টম। সে জানত না চাচা বাড়িতেই আছেন, জানলে এদিকে ভুলেও আসত না। শহরে ফেরার পর জজসাহেব উইল বদলেছেন, এ-ও টমের জানা নেই। এই মুহূর্তে চাচাকে উইল ছিঁড়তে দেখে মনে মনে আঁতকে উঠল সে। ভাবল, তার মানে কি তাকে বঞ্চিত করে নতুন উইল করতে যাচ্ছেন চাচা? কী সর্বনাশ!

নির্লজ্জ হতে টমের কখনও বাধে না। হঠাৎ সে ছুটে এসে জজসাহেবের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শুধু কি তাই? কিভাবে

যেন মুহূর্তের মধ্যে দু'চোখ থেকে পানির দুটো ধারা ছেড়ে দিল। কাঁদছে আর বলছে, 'এই তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, এখন থেকে সৎ পথ ত্যাগ করে এক ইঞ্চিও এদিক ওদিক যাব না। জুয়ার টেবিলে আমাকে দেখা গেছে, এখবর যদি কখনও পাও তুমি, চাবুক মেরে আমার পিঠের ছাল তুলে ফেলো!'

হিসাবে টম খুব পাকা, তার ভুল হয়নি। জজ দ্রিঙ্কল ভাইপোকে স্নেহ করেন, তাকে এভাবে কাতর হতে দেখে স্বভাবতই বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিরস্কার করার কথা তাঁর মনে থাকল না, বরং নরম নরম মিষ্টি কথায় সান্ত্বনা দিতে শুরু করলেন।

ধীরে ধীরে সাহস পেল টম। সে বলল, 'চাচা, এ-কথা তুমি কি করে ভাবলে যে প্রাণের ভয়ে লুইজি ক্যাপোলোকে আমি চ্যালেঞ্জ করিনি? চ্যালেঞ্জ করিনি সম্পূর্ণ অন্য কারণে। সে কি ভদ্রলোক নাকি যে তার সঙ্গে আমি লড়ে নিজের সম্মান হারাব? তাকে তো একটা নরাধম বললেই হয়।'

'তারমানে? কি বলতে চাও তুমি?' জজ দ্রিঙ্কল বিস্মিত। 'ওরা কাউন্ট না?'

'কাউন্ট হয়েছে তো কি! ওই লুইজির ব্যক্তিগত চরিত্র কেমন, সে খবর তুমি রাখো? শহরের যে-কোন লোককে জিজ্ঞেস করে দেখো, সবাই জানে যে সে একটা খুনী।'

'খুনী?' লাফিয়ে চেয়ার ছাড়লেন জজ সাহেব। 'লুইজি ক্যাপোলো খুনী?'

'তবে আর বলছি কি! গুবরে উইলসন তার হাত দেখে বলল,

সে মানুষ খুন করেছে। কই, সে তো অভিযোগটা অস্বীকার করল না! মুখ চুন করে বসে থাকল। তার ভাই, ওই অ্যাঞ্জেলোটা, বাধ্য হয়ে স্বীকার করল...'

'স্বীকার করল? লুইজি খুনী, এ-কথা তার ভাই অ্যাঞ্জেলো স্বীকার করল? একেবারে মানুষ খুন? কোথায়, টম? কবে?' জজ দ্রিস্কল উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছেন। 'একজন খুনীর ফাঁসি হয়নি, সভ্যসমাজে দিব্যি বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করছে, এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়!'

টমের চেহারা একটু যেন ম্লান হলো। 'ঘটনাটা ভারতবর্ষে ঘটেছে। গায়কোয়াড়ের মহারাজার প্রাসাদে...'

জজ দ্রিস্কল অনেকটাই চুপসে গেলেন। 'আমেরিকায় নয়? ভারতবর্ষে? তা-ও আবার স্বাধীন গায়কোয়াড় রাজ্যে? নাহ্, মার্কিন আইনের হাত অতটা লম্বা নয়...'

'তা নয়। কিন্তু নৈতিক বিধিনিষেধ সবাইকেই মেনে চলতে হবে। সেজন্যেই আমি সিদ্ধান্ত নিই, ওর সঙ্গে ডুয়েল লড়া কোন ভদ্রলোকের কাজ হতে পারে না। তুমি আসলে কোন খবরই রাখো না, তাই অমন হুট করে চ্যালেঞ্জ করে বসেছ। তবে এখন আর বোধহয় কিছু করার নেই। দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান ফিরিয়ে নেয়া যায় না।'

সাধারণ নিয়ম হলো, আহ্বান প্রত্যাহার করা যাবে না। তবে কথা আছে। যে লোক খুনী, তার বেলায় সাধারণ নিয়ম খাটবে কেন? হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটাকে একটা ইস্যু বানাতে পারলে, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা সম্ভব যে শেষ পর্যন্ত হয়তো জজ দ্রিস্কলকে

লড়তে হবে না।

কিন্তু যে কারণই দেখানো হোক, লড়তে না চাওয়ার মধ্যে অবশ্যই একটা ভীরুতা আছে। এই ভীরুতা জজ দ্রিঙ্কল কি স্বীকার করে নেবেন? মনে হয় না।

টম এখানে খুব চালাকি করছে। তার যুক্তি হলো, বিশেষ একটা কারণে ডুয়েল লড়তে রাজি হয়নি সে। কিন্তু ওই একই কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চাচাকে ডুয়েল লড়তে সে নিষেধ করছে না। অর্থাৎ সে চাইছে, চাচা ডুয়েল লড়ুক। বুড়ো মানুষ, ডুয়েলে অবশ্যই মারা পড়বে, এটাও সে জানে। চাইছেও ঠিক তাই।

চাচা মারা পড়লে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে টম, উইল পাল্টাবার আর কোন ভয় থাকবে না। এখনকার অবস্থা ঠিক যেন সারাক্ষণ তার গলায় ছুরি ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। বিনা নোটিশে যখন তখন তার ওপর খেপে যেতে পারে চাচা, কলমের এক খোঁচায় তাকে বঞ্চিত করতে পারে বিপুল সয়-সম্পত্তি থেকে। তারচেয়ে লুইজির হাতে গুলি খেয়ে মরুক বুড়োটা। মরার জন্যে পাখাও তো গজিয়েছে, তা না হলে এই বয়সে কেউ কাউকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়? সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা! লড়াই একটা হবেই। হোক। লুইজির গুলি খেয়ে মরুক বুড়োটা।

মনে মনে হাসছে টম। ঈশ্বর সত্যি তার ওপর সদয়। ঈশ্বর সদয় না হলে তার মত একটা দাসীর ছেলে কি করে সম্ভ্রান্ত বংশের মাথার তাজ হয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে? টমের ধারণা হলো, তার ভাগ্যগুণেই জজ দ্রিঙ্কল মারা পড়বেন।

ডুয়েলের তারিখ দ্রুত এগিয়ে আসছে। জজ দ্রিস্কল বসে নেই, তিনি তাঁর বন্ধু হাওয়ার্ডের সাহায্যে ক্যাপোলো ভাইদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। সত্যি যদি লুইজি খুনী হয়, তার সঙ্গে লড়তে রুচির সমর্থন পাওয়া বেশ কঠিন হবে বৈকি। এই ডুয়েলে তার মৃত্যু হলে সে মৃত্যুতে কোন সন্তুষ্টি বা তৃপ্তি থাকবে না।

দু'দিন পরই রিপোর্ট করলেন হাওয়ার্ড। জজ দ্রিস্কলের মন থেকে খুঁতখুঁতে ভাবটা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল। হাওয়ার্ড পাকা খবর এনেছেন। ক্যাপোলোরা নিপাট ভদ্রলোক। তাদের বংশমর্যাদা ও আভিজাত্য প্রশ্নাতীত। ইটালিতে তো বটেই, যুক্তরাষ্ট্রেও সবাই তাদের প্রশংসায় মুখর। গুবরে উইলসন লুইজির হাত দেখে বলেছেন যে সে মানুষ খুন করেছে, তাই হাওয়ার্ড তার সঙ্গেও কথা বলেছেন। উইলসন পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, লুইজি মানুষ খুন করে কোন অপরাধ করেনি। আততায়ীকে খুন করা কোন দেশেই অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না।

জজ দ্রিস্কল রিপোর্ট শুনে স্বস্তি ফিরে পেলেন। ভাইপো টম নিজেকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনবে বলে কথা দিয়েছে। এদিকে ডুয়েল লড়ার জন্যে প্রতিপক্ষও জুটেছে অত্যন্ত যোগ্য। এই ডুয়েলে মৃত্যু হলেও তাঁর শান্তি।

সাত

ওদিকে লুইজি ক্যাপোলো সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জজ দ্রিস্কলকে কোনমতেই মরতে দেয়া যাবে না। এমন কি সে লক্ষ রাখবে, বৃদ্ধের গায়ে সামান্য আঁচড়টিও যেন না লাগে। সম্ভব হলে নিরস্ত্র হয়েই ডুয়েলে নামত সে, কিন্তু আয়োজনকারীরা অনুমতি দেবে না। গুলি ছোঁড়ার সঙ্কেত দেয়ার আগে খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু পরীক্ষা করে দেখবে তারা। পিস্তলে গুলি আছে কিনা তা-ও তারা দেখতে ভোলে না।

সেদিন ভোর হতে না হতে প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্ধারিত স্থানে হাজির হলো। নদীর কাছেই উঁচু একটা জায়গা বাছাই করা হয়েছে। এদিকে কোন লোকবসতি নেই। ঘাস না থাকায় রাখালরাও এদিকে গরু-ছাগল চরাতে আসে না।

আগেই ঠিক হয়েছে জজ দ্রিস্কলকে সাহায্য করবেন হাওয়ার্ড, আর লুইজিকে সাহায্য করবে তার ভাই অ্যাঞ্জেলো। আরও এক ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, তিনি একজন ডাক্তার। জায়গাটা লোকালয় থেকে বেশ দূরে বলেই আনা হয়েছে তাঁকে। কেউ চায় না এই ডুয়েলের পরিণতি মারাত্মক কিছু হোক।

সহায়করা বিশ কদম দূরত্ব মাপলেন। এক প্রান্তে দাঁড়ালেন জজ দ্রিস্কল, অপরপ্রান্তে লুইজি।

সঙ্কেত দিলেন হাওয়ার্ড। এক, দুই, তিন···

ডাক্তার এই মুহূর্তে কোন কাজে ব্যস্ত নন, কাজেই উপস্থিত পাঁচজনের মধ্যে একমাত্র তারই সুযোগ আছে খুঁটিনাটি প্রতিটি জিনিস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করার। তিনি দেখলেন এবং বিস্মিত হলেন–জজ দ্রিস্কলের দিকে নয়, লুইজি গুলি করল আকাশের দিকে।

'একি! একি!' হতভম্ব ডাক্তার ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় পাওয়া গেল না। তার আগেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে অ্যাঞ্জেলো।

'ডাক্তার! জলদি! আমার ভাই আহত হয়েছে!'

পিস্তলে জজ দ্রিস্কলের হাত মোটেও ভাল নয়। সেই হাত আরও খারাপ করারই চেষ্টা করেছেন তিনি, প্রতিদ্বন্দ্বীর বুক ও মাথা এড়াবার জন্যে। তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। গুলিটা লেগেছে লুইজির ডান হাতে। তাও লাগত না, মাথার বেশ খানিক ওপর দিয়েই বেরিয়ে যেত। কিন্তু লুইজি আকাশের দিকে গুলি করার জন্যে মাথার ওপর হাত তুলেছিল, সেজন্যেই লাগল।

ছুটে এসে ভাইকে ধরে ফেলল অ্যাঞ্জেলো। লুইজি অভয় দিয়ে হেসে বলল, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমার তেমন কিছু হয়নি।'

ডাক্তারও ছুটে এসে হাতটা পরীক্ষা করছেন। একটু পরই তাঁর মুখে হাসি ফুটল। 'আসুন, সবাই আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

জানাই। বিপদটা অল্পের ওপর দিয়ে গেছে।'

গুলিটা হাড় না ছুঁয়েই বেরিয়ে গেছে। ক্ষতের ওপর ব্যান্ডেজ বাঁধছেন ডাক্তার। হাওয়ার্ডকে সঙ্গে নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন জজ দ্রিস্কল। 'কর্তব্য এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না,' প্রায় ক্ষমাপ্রার্থনার সুরেই বললেন তিনি। 'কিন্তু বলে বোঝাতে পারব না সেজন্যে আমি কতটুকু দুঃখিত...'

সম্মান দেখিয়ে মাথা ঝাঁকাল লুইজি, বলল, 'মি. দ্রিস্কল, প্লীজ, লজ্জা দেবেন না।'

ডাক্তার কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে দেখে লুইজি বুঝতে পারল, এই ভদ্রলোক জানেন যে সে আকাশের দিকে গুলি করেছে। একটা চোখ টিপে নিষেধ করল সে, তিনি যেন মুখ না খোলেন।

জজ দ্রিস্কল এবার অ্যাঞ্জেলোর দিকে ফিরে বললেন, 'এখন যদি আমি আপনাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে চাই, তাতে কি আপনাদের আপত্তি আছে? আপনাদের এত সব গুণের কথা শুনেছি...'

হাসিমুখে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে অ্যাঞ্জেলো বলল, 'আপনাকে বন্ধু হিসেবে পেলে আমরা দু'জনই অত্যন্ত খুশি হব, মি. দ্রিস্কল। কর্তব্যের খাতিরেই ডুয়েলের আহ্বান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি আমরা। আপনি আহত হলে নিজেদেরকে আমরা ক্ষমা করতে পারতাম না। লুইজি আহত হওয়ায় সত্যি আমরা স্বস্তিবোধ করছি।'

ডাক্তারের দিকে ফিরে এবার অ্যাঞ্জেলোও চোখ টিপল।

*

ডাক্তার ভদ্রলোকের বিচার-বুদ্ধি প্রখর। তাঁর বিবেচনায় এই ডুয়েলে লুইজি ক্যাপোলো যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছে তা গোপন করে রাখাটা অন্যায় হবে। ক্যাপোলোরা চোখ টিপে নিষেধ করায় সেই মুহূর্তে কথাটা তিনি প্রকাশ করতে পারেননি, কিন্তু শহরে ফেরার পর তিনি তার এক বন্ধুকে পুরো ঘটনাটা শোনালেন।

এ-কান ও-কান হতে হতে জজ দ্রিস্কলের কানেও কথাটা উঠল। শুনে বিহ্বল হয়ে পড়লেন তিনি, দুই ভাইকে আপন করে নেয়ার জন্যে একটা ব্যাকুলতা অনুভব করলেন। আহত হওয়ায় ঘর থেকে বেরুচ্ছে না লুইজি, জজ দ্রিস্কল প্রতিদিন তাকে দেখতে আসছেন।

ইতিমধ্যে ডসন বাসীরা লুইজিকে বীরের মর্যাদা দেয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়েছে। যারা তার ঘনিষ্ঠ, তারাও যেন নতুন করে তাকে আবিষ্কার করল। রাস্তায় বেরুলেই দুই ভাইকে ঘিরে ধরে লোকজন, কে কার আগে হ্যান্ডশেক করতে পারবে তারই প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। চারদিক থেকে চিৎকার শোনা যায়, 'থ্রী চিয়ার্স!' শহর জুড়ে এখন শুধু ওদের প্রশংসা আর গুণকীর্তন।

ওদিকে গুবরে উইলসনের কপাল খুলে গেছে। মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি, কাউন্টরা দুই ভাই তাকে সমর্থন দিচ্ছে। হঠাৎ করে তারা অস্বাভাবিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় গুবরে উইলসনের প্রচার-প্রচারণায় সেটা খুব কাজে লেগে গেল। শহরের লোকজন এই মুহূর্তে লুইজি আর অ্যাঞ্জেলো বলতে অজ্ঞান, ফলে নির্বাচনে ওরা দু'জন যাকে সমর্থন দেবে তারা কি তাকে ভোট না

দিয়ে পারে? গুবরে উইলসনই যে নির্বাচনে জিতছে তাতে আর সন্দেহ কি।

উইলসন সত্যিকার একজন ভদ্রলোক। কারও দ্বারা উপকৃত হলে অবশ্যই তিনি তার প্রতিদান দেবেন। কাউন্টরা তাঁকে সমর্থন করছে, বিনিময়ে তিনিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে কিছু একটা করবেন। সে উপায়ও তাঁর হাতে আছে বৈকি। মেয়র নির্বাচন হয়ে গেলেই শুরু হবে অল্‌ডারম্যান নির্বাচন। উইলসন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অল্‌ডারম্যান নির্বাচনে লুইজিকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাবেন। মেয়র হয়ে তিনি যদি লুইজিকে সমর্থন দেন, নির্বাচনে তার প্রভাব পড়তে বাধ্য।

সবাই খুশি, একা শুধু টম দ্রিঙ্কল ছাড়া। সে ধরেই নিয়েছিল লুইজির গুলি খেয়ে পটল তুলবে বুড়ো চাচা। আর বুড়ো মরলেই তাঁর সব টাকা ও সম্পত্তি পেয়ে যাবে সে। প্রচুর দেনা আছে, সেগুলো তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিতে হবে। কারণ দেনা থাকায় জুয়ার টেবিলে তাকে বসতে দেয়া হচ্ছে না। চুরিতে তার আয় মন্দ নয়, কিন্তু রোজ তো আর চুরি করার সুযোগ হয় না। ধরা পড়ার ভয় আছে, তাই এই পেশায় এখনও সে ঘাঘু চোরদের মত বেপরোয়া হতে পারে না।

কিন্তু তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে চাচাটা না মরায়। দেনা-টেনা শোধ করে জুয়ার টেবিলে ফিরে যাবার একটা উপায় তার হাতে আছে বটে, কিন্তু সেখানেও বাধা। গায়কোয়াড়ের সেই ছোরাটা, যেটা সে ক্যাপোলোদের ঘর থেকে চুরি করেছিল। ছোরাটা বিক্রি করতে পারলে মোটা টাকা পাওয়া

যাবে। ওটার হাতলে ঝকমক করে পাথরগুলো, সন্দেহ নেই হীরে-চুনি আর পান্নাই হবে। ন্যায্য দাম পেলে দেনা তো শোধ হবেই, আগামী দশ বছর জুয়া খেলার জন্যে টাকারও কোন অভাব থাকবে না। কিন্তু কাউন্টদের নিয়ে শহরে এখন খুব হৈ-চৈ হচ্ছে, গায়কোয়াড়ের ছোরাটাও শহরে কম কুখ্যাতি অর্জন করেনি, ফলে সাহস করে সেটাকে টম বাইরে বেরই করতে পারছে না। যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে বসে? না, বাবা, থাক–ধরা পড়লে স্রেফ জেল খাটতে হবে।

কিন্তু এখন তাহলে কি করবে টম?

অনেক ভেবেচিন্তে রক্সির কাছে পরামর্শ করতে এল সে। বুদ্ধির প্যাঁচ কষতে রক্সির জুড়ি নেই। প্রমাণ? কেন, টম নিজেই তো জ্বলজ্যান্ত একটা প্রমাণ। রক্সি বুদ্ধির প্যাঁচ না কষলে আজ কি ক্রীতদাসীর সন্তান হওয়া সত্ত্বেও অভিজাত ড্রিস্কল বংশের দুলাল হতে পারত সে? টম নিজেকে অকৃতজ্ঞ ভাবতে রাজি নয়। প্রকাশ্যে জননীকে রক্সি, অর্থাৎ নাম ধরেই ডাকে সে; কিন্তু আড়ালে ডাকে মা বলে। বিশেষ করে রক্সিকে দিয়ে কোন কুকাজ করাবার দরকার পড়লে, আদুরে গলায় মা মা করতে তার খারাপ লাগে না।

আজও রক্সিকে নরম গলায় টম বলল, 'বড় বিপদে পড়েছি গো মা। তাই তোমার কাছে ছুটে এলাম। ভাল একটা বুদ্ধি দাও দেখি।'

হাজার হোক মায়ের মন, ছেলের ডাক শুনে একেবারে গলে গেল। রক্সি ভোলেনি, এই ছেলের দাবি আজ থেকে তেইশ বছর

আগেই ত্যাগ করেছে সে। 'ছি, বাপ, এ-কথা বলে না। আমি থাকতে তোমার আবার কি বিপদ! সব কথা খুলে বলো আমাকে, জীবন দিয়ে হলেও তোমার সমস্যা সমাধান করে দেব আমি।'

প্রশ্রয় পেয়ে সব কথাই বলে ফেলল টম। জজসাহেবকে বারবার সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, জীবনে আর কখনও জুয়া খেলবে না। কিন্তু সন্ধে হলেই নেশাটা এমন অস্থির করে তোলে তাকে যে নিজেকে সে ধরে রাখতে পারে না। জুয়ায় হার ও জিত, দুটোই আছে। যতবার জেতে সে, তারচেয়ে অনেক বেশি বার হারে। জিতলে, জেতা টাকা কিছুক্ষণের মধ্যেই খরচ হয়ে যায়। হারলে হ্যান্ডনোট লিখে দিতে বাধ্য হয়। এই রকম হ্যান্ডনোট এখন বন্ধুদের হাতে অসংখ্য। তাদের তাগাদায় তার জীবন নরক হয়ে উঠেছে। কাজেই দেনা শোধ করার জন্যে বাধ্য হয়ে রাতের বেলা চুরি করতে বেরুতে হয় তাকে। কিন্তু দশ রাত বেরুলে একরাত চুরি করার সুযোগ মেলে, বাকি নয় রাত খালি হাতে ফিরতে হয়। কাজেই এভাবে দেনা শোধ করা সম্ভব নয়। আবার সময় মত দেনা শোধ করতে না পারলে পাওনাদাররা তাকে ছাড়বে না। এই অবস্থায় টম এখন কি করবে? সে যে সত্যি খুব কঠিন বিপদে পড়েছে, তা তার চেহারা দেখেই বোঝা গেল। মায়ের সামনে প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।

ছেলেকে আদর করে রক্সি বলল, 'লক্ষ্মী সোনা আমার, একটুও চিন্তা করো না। জজসাহেব তোমার পর, কিন্তু আমি তোমার জন্মদাত্রী মা। পর বলেই বুড়োটা মরতে রাজি হয়নি। বুড়ো জানে, সে মরলে তোমার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়! সেজন্যেই

তো মরল না। মরবে কেন, তার কি রক্তের টান আছে? কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার নাড়ির সম্পর্ক। কেউ মরল কি মরল না, তাতে কিছু আসে যায় না। আমি তোমার জন্যে মরতে রাজি আছি।'

একটা ঢোক গিলল টম। মুখ হাঁ হয়ে আছে। রক্সি তার উপকার করার জন্যে মরতে পর্যন্ত রাজি, শোনার পরও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে সময় লাগল তার। তারপর চিন্তা করতে লাগল, রক্সি মরলে তার কি কি সুবিধে হতে পারে। ঘোড়ার ডিম সুবিধে। রক্সির কাছে কি সম্পত্তি আছে? নেই। অনেক কষ্টে চারশো ডলার জমিয়ে ছিল, ব্যাংক ফেল মারায় তা-ও গেছে।

ছেলেকে হতভম্ব হতে দেখে রক্সির ঠোঁটে বিষণ্ন হাসি ফুটল। 'বাপ রে, জীবন তো তুচ্ছ, তোমার জন্যে আমি আরও কঠিন ত্যাগও স্বীকার করতে পারি। যে কষ্টকে নরকযন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা করা যায়, আমি সেই কষ্ট করব। তোমার জন্যে আবার আমি দাসী হব।'

'মানে?' টম স্তম্ভিত।

'মানুষ কেনা-বেচার হাটে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুমি বিক্রি করে দাও, বাপ। অনেক টাকা পাবে। সেই টাকায় দেনা শোধ করো। আরেকটা কথা। ডসন ল্যান্ডিঙের মত ছোট শহরে তোমার ওই ছোরা বিক্রি হবে না। এখানে বিক্রি করতে যাওয়াটা সাংঘাতিক ঝুঁকির কাজও বটে। তুমি হয় নিউ ইয়র্কে, নাহয় সেইন্ট লুইয়ে চলে যাও। সেইন্ট লই তো বেশি দূরে নয়, ওখানে গেলেই ভাল হয়। রত্নগুলো বেচে বেশ মোটা টাকাই পাবে তুমি।

সেই টাকায় আমাকে কিনে নিয়ে আসবে। তুমি যতদিন না ছোরাটা বিক্রি করতে পারছ, আমি দাসী হিসেবেই কোথাও থাকলাম। খুব বেশি হলে ছ'মাস? নাহয় এক বছরই? তোমার জন্যে এই ক'মাস ঠিকই কাটিয়ে দিতে পারব আমি, যত কষ্টই হোক।'

অসৎ এবং অপরাধপ্রবণ হলেও, রক্সির কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল টম। তার উপকার করার জন্যে দাসীর জীবনে ফিরে যেতে চাইছে মেয়েলোকটা! এত বড় ত্যাগ কল্পনা করা যায় না। জীবনে সম্ভবত এই প্রথম কৃতজ্ঞতাবশত তার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। খানিকটা লজ্জা আর সঙ্কোচও জাগল মনে। যে মা তাকে এত ভালবাসে, ছেলে হয়ে সে তাকে বাজারে বিক্রি করে দেবে? জেনেশুনে, নিজের স্বার্থে, দাসীর জীবনে ফেরত পাঠাবে? ইস্, দাসী হয়ে না জানি কত কষ্ট করতে হবে বেচারিকে! দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আনতে ছ'মাসই হয়তো লাগবে, কিন্তু ছ'মাসও তো কম সময় নয়। না-না, ছ'মাস নয়, সে তাকে যেভাবেই হোক দু'তিন মাসের মধ্যে ছাড়িয়ে আনবে।

মা-বেটার সেদিন অনেক কথাই হলো। মাকে মুক্ত করে আনার পর টম তাকে নিজের কাছেই রাখবে। জজসাহেব বেশিদিন বাঁচবেন না, তিনি মারা গেলে এ-বাড়ির কর্ত্রী হিসেবেই থাকবে রক্সি। টমও ভাল হয়ে যাবে, মায়ের প্রতিটি নির্দেশ মাথা নত করে মেনে চলবে। অসম্ভব, মায়ের এই চরম ত্যাগ আর ভালবাসার কথা কোনদিন সে ভুলবে না। না, কোনদিন না!

দুই পাপী সেদিন কয়েক মুহূর্তের জন্যে পবিত্র জীবনের

প্রশান্তি ও আনন্দ উপভোগ করল, ঈশ্বরের খেয়াল বশে। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিল টম, চোখ দুটো তখনও তার ভেজা ভেজা। কাল এসে রক্সিকে মানুষ কেনা-বেচার হাটে নিয়ে যাবে সে।

ছেলেকে বিদায় দেয়ার আগে একটিমাত্র প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল রক্সি। 'টম, বাপ আমার, তুমি কথা দাও যে আর যেখানেই আমাকে বিক্রি করো, ভাটি এলাকায় বিক্রি করবে না। সেখানে যদি গিয়ে পড়ি, তুমি শত চেষ্টা করেও আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। শুনেছ বোধহয়, ওদিকে তুলোর চাষ হয়–খেতে কাজ করায় তো, জান একেবারে বের করে নেয়। খেতে হাঁটু সমান বরফ-কাদা জমে থাকে, সারাদিন তাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। চাবুক খেয়ে মারাও যায় অনেকে। না, বাপ, আমার এত বড় সর্বনাশ তুমি কোরো না! দু'পয়সা কম পেলেও গৃহস্থ বাড়িতে বেচো আমাকে।'

টম কিরে-কসম খেয়ে বলল, 'মা, তুমি কি আমাকে জানোয়ার মনে করো? আমার টাকার লোভ কি এতই বেশি যে সব জেনেও তোমাকে আমি ভাটি এলাকায় পাঠিয়ে দেব? ওখানে পাঠানো আর নরকে পাঠানো একই কথা, ভেবেছ তা আমি জানি না? না, মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার সঙ্গে আমি এত বড় বেঈমানী করব না।'

ছেলের কথা বিশ্বাস করল রক্সি।

জন্মদাত্রী মাকে বিক্রি করে দেবে টম। ভোর হতেই মানুষ কেনা-বেচার হাটে ছুটল সে। হাটে দালালের অভাব নেই, তারা কেউ

টমকে চেনে না। তবে জজ দ্রিস্কলের নাম বলতে সবাই বেশ খাতির করল। টমের নামে শহরে ইদানীং যে নিন্দার ঝড় উঠেছে সে-খবর দালালদের জানা নেই। দাস-ব্যবসার এই দালালরা এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। নিজেদের ঘৃণিত ব্যবসা ছাড়া আর কিছু বোঝে না তারা, বুঝতে চায়ও না।

দাসীর বর্ণনা চাইল দালালরা। টম বলে যাচ্ছে। দাসীর বয়স হবে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। মজবুত কাঠামো, গায়ে প্রচুর শক্তি রাখে। যতই কঠিন কাজ দেয়া হোক, করতে পারবে, অসুস্থ হয়ে পড়ার কোন ভয় নেই। দেখতে কেমন? এরকম বয়সে যতটা ভাল হওয়া সম্ভব, তারচেয়েও ভাল। গায়ের রঙ? এ নিয়ে কোন চিন্তা করতে হবে না। জাতে সে নিগ্রোই, কিন্তু গায়ের রঙ তার প্রায় সাদা। মিশ্র রক্ত, দেখলেই বোঝা যায়।

বিবেক ও শালীনতাবোধ বর্জিত কোন মানুষ ছাড়া নিজের মায়ের সম্পর্কে এভাবে কেউ কথা বলতে পারে না। টম যে মানুষ নামের অযোগ্য, তা আরেকবার সে প্রমাণ করল। কাল রাতে রক্সির উদারতা দেখে তার মন একটু নরম হয়ে পড়লেও, আজ সকালে আবার সে নিজ স্বার্থে ইতর হবার প্রয়োজনটাই বড় করে দেখছে। এখন তার মাথায় একটাই চিন্তা, প্ল্যানটা কিভাবে সফল করা যায়। অনেক রকম বাধাই আশঙ্কা করছে টম। এ-কথা ঠিক যে রক্সি এক সময় ক্রীতদাসী ছিল। কিন্তু পার্সি দ্রিস্কল মৃত্যুর আগে তাকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। মুক্তি পাবার পর স্বাধীন মানুষ হিসেবে মিসিসিপি স্টীমার কোম্পানিতে কয়েক বছর চাকরিও করেছে রক্সি। কাজেই এখন তাকে ক্রীতদাসী বলে চালাবার চেষ্টা

করাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ধরা পড়লে বিচারে শাস্তি পেতে হবে টমকে।

তবে কথা হলো, অত ভয় না পেলেও চলে। কারণ রক্সি নিজে তো আর প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে না। ক্রীতদাসী নিজেই যদি বলে যে সে ক্রীতদাসী, তাহলে তা নিয়ে কেন কেউ সন্দেহ করতে যাবে?

টম দালালকে রক্সির দৈহিক ও মানসিক বর্ণনা দেওয়ার পর জানতে চাই, 'এরকম একটা তাজা ও পরিশ্রমী বাঁদীর দাম কত হতে পারে?'

'এই এলাকায়?' দালাল পাল্টা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, এই এলাকায়?'

'এই এলাকায় ভাল দাম পাবে না। খুব বেশি হলে দু'শো ডলার। বাঁদীকে দেখে খদ্দেরের মন যদি ভরে যায় তাহলে হয়তো আরও পঞ্চাশ ডলার আশা করতে পারো।'

'এত কম?' বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল টম। কি আশ্চর্য! এত কম টাকায় তার চলবে কি করে! দু'শো বা আড়াইশো ডলারে তার অর্ধেক দেনাও তো শোধ হবে না!

দালালরা তো ঝোপ বুঝেই কোপ মারে। বাঁদীকে বেশি দামে বিক্রি করা গেলে তাদের দালালির পরিমাণও বাড়ে। এই দালালটা টমকে লোভ দেখাল, 'তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত কিভাবে দুটো পয়সা বেশি পাও। কিছু যদি মনে না করো তো একটা প্রশ্ন করি, বাঁদীটাকে তুমি এই এলাকায় বেচতে চাইছ কেন? বাঁদীর উপর আবার এত দরদ কিসের? তুমি যদি ওকে ভাটি এলাকায় বেচতে

চাও, আমি তোমাকে মোটা টাকা পাইয়ে দিতে পারি। এই ধরো, পাঁচশো।'

পাঁচশো ডলার! টমের চোখ দুটো আনন্দে নেচে উঠল। পাঁচশো ডলার পেলে তার সব দেনা শোধ হয়ে যাবে, তারপরও পকেটে কিছু থাকবে। 'ঠিক জানো পাঁচশো ডলার পাওয়া যাবে?' সে নিসন্দেহ হতে চাইছে।

'কমপক্ষে পাঁচশো। বরাত জোরে ভাল কোন খদ্দের জুটে গেলে ছ'শো ডলারও পেয়ে যেতে পারো। কি করবে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও। তবে একটা প্রশ্ন করি, এই এলাকার যে লোকের কাছে তাকে তুমি আজ বেচলে, সে যদি কালই আবার তাকে দক্ষিণের ভাটিতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়? তাই আমার কথা হলো, বেচতে যখন এসেছ, বেশি দামেই বেচো।'

দালাল টমের মনের কথাই বলছে। কথা তো সত্যি! রক্সিকে এখানে বিক্রি করে কোন লাভ নেই, কারণ খদ্দের তাকে ভাটি এলাকায় নিয়ে আবার বিক্রি করে দিতে পারে। দিতে পারে নয়, দেবেই। মাঝখান থেকে টমকে ভাল মানুষির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে দু'তিনশো ডলার। এখানে একটা কিন্তু আছে। বিক্রি করলে জননীর এতই যখন বিপদের আশঙ্কা, সে তাহলে তাকে বিক্রি করতে চাইছে কেন? নিজেকে তিরস্কার করল টম। খবরদার, পুরানো প্রসঙ্গ নতুন করে তোলা যাবে না। রক্সি তার কে? কেন, জন্মাদাত্রী মা নয়? হুহুঁ, কি আমার জন্মদাত্রী রে। এত দিন তো জানতেই দেয়নি আমি তার ছেলে। তাছাড়া বুদ্ধির প্যাঁচ কষে মা-ছেলের দূরত্ব এতটাই বাড়িয়ে ফেলেছে, তাকে মা বলে ভাবতে

কেমন যেন হাসি পায়। না-না, টাকা তার খুবই দরকার। আগে নিজের জান বাঁচাতে হবে।

কয়েক মিনিট পর দালাল টমকে একজন খদ্দেরের কাছে নিয়ে এল। বাজারের এদিকটায় শুধু ভাটি এলাকার খদ্দেরই ভিড় করে।

টমের মুখে যেমন শুনেছে, সেভাবেই রক্সির রূপ-গুণের বর্ণনা দিল দালাল। জিনিস না দেখেই সেই মুহূর্তে পাঁচশো ডলার দাম দিতে রাজি হয়ে গেল খদ্দের। জানাল, দেখে যদি ভাল লাগে আরও পঞ্চাশ ডলার দেবে। ভাটি এলাকার খদ্দেররা সহজে ভাল বাঁদী পায় না।

তারপর রক্সিকে হাটে এনে তুলল টম। খদ্দের তাকে দেখেই খুশি মনে পকেট থেকে ছ'শো ডলার বের করে দিল। দলিল লিখতে ও সই করতে দশ মনিটের বেশি লাগল না।

কি এক অজানা ভয়ে রক্সির বুক ধড়ফড় করছে। বুঝতে পেরে টম তার কানে ফিসফিস শুরু করল, 'এখান থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে, এই তো নদীর ঠিক ওপারে, নিউ কেন্টাকিতে। যতদিন তোমাকে আবার কিনে আনতে না পারি, দু'চার দিন পরপর আমি গিয়ে দেখে আসব। তারপর, আমার কাছে ফিরে এসে তুমি দেখবে ছেলে হিসেবে আমি তোমাকে কতটা ভালবাসতে পারি।'

আট

ওনিল নামে এক লোক রক্সিকে কিনেছে। সে একজন চাষী, তুলো চাষ করে প্রচুর টাকা করেছে। দলিল সই হবার দশ মিনিটের মধ্যে রক্সিকে স্টীমারে তুলল সে। রক্সি কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে আছে। মা হিসাবে ছেলের কাছ থেকে যে রকম ব্যবহার পাওয়া উচিত তা রক্সি টমের কাছ থেকে কোনদিনই পায়নি। শুধুমাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজটা করা কি তার উচিত হলো?

এ প্রসঙ্গে কাল রাতে টমের সঙ্গে তার প্রথম কথা হয়। তখন থেকে আজ বেলা দুপুর পর্যন্ত এটা নিয়ে ভাবার সুযোগ পায়নি, তা আসলে ঠিক না। কিন্তু সুযোগ পেলেও এ ব্যাপারে ভাল-মন্দ কিছু ভাবতে তার মন চায়নি। একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে ছিল সে। যতই হোক সে তো মা, ছেলের জন্যে নিজেকে অন্যের কাছে উৎসর্গ করে দিতেই পারে, এতে এত ভাবাভাবিরই বা কি আছে।

কিন্তু স্টীমারে ওঠার পর ঘোরটা কেটে গেল। আবেগটুকু দমিয়ে রেখে অঙ্ক কষছে রক্সি। সে তো একজন দাসী ছিল। এখন আবার দাসী হলো। এর আগে পার্সি ড্রিস্কলের দাসী ছিল সে।

মরার আগে পার্সি ড্রিস্কল তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। সেবার নিতান্তই ভাগ্য গুণেই মুক্তি পেয়েছিল রক্সি। ভাগ্যের সঙ্গে কর্তব্যনিষ্ঠার উপহার।

রক্সির আসল রূপ যে কি, পার্সি ড্রিস্কল তা কোনদিনই জানার সুযোগ পাননি। রক্সি নিষ্ঠার আবরণে তার ভেতরের শয়তানিকে লুকিয়ে রেখেছিল। সে তার মনিবের সন্তানকে ক্রীতদাস বানাবে, সেটা স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিল কেউ? একমাত্র ঈশ্বরই তার এই অপকর্মের কথা জানেন। কেউ না জানাতেই শাস্তির বদলে সে পেয়েছে পুরস্কার–মুক্তি! কোন ক্রীতদাসীর জন্যে এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু ঈশ্বরকে ফাঁকি দেওয়া কি এতই সহজ? তিনি সব দেখেছেন বলেই ঠিক সময় উচিত শাস্তি দিতে দেরি করেননি। নিজের ইচ্ছায় আবার তার আগের জীবনে ফিরে এসেছে রক্সি। মুক্তি পেলেও তা বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি সে। প্রশ্ন হলো, আগের মত অত সহজে কি এবারও মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে?

সত্যি কথা বলা টমের স্বভাবে নেই। সে বলেছে টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলে দু'চার মাসের মধ্যেই সে তার মাকে আবার মুক্ত করে আনবে। তার কথা অবিশ্বাস করেনি রক্সি। কিন্তু টমের মধ্যে আন্তরিকতার লেশমাত্র নেই। তবুও যদি ধরে নেওয়া হয় মাকে মুক্ত করার ইচ্ছা তার আছে এবং যদি সে চেষ্টাও করে, তাও মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খায় এত টাকাই বা সে কোথায় পাবে?

বৃদ্ধ জর্জ ড্রিস্কলই টমের একমাত্র আশা ভরসা। তিনি মারা

গেলে সমস্ত ধনসম্পদ টমের হাতে চলে আসবে। কিন্তু খুব শিগগির যে জজ সাহেবের মৃত্যু হবে তারই বা কি নিশ্চয়তা আছে! আগামী দু'বছর তিনি হাসতে হাসতে টিকে থাকবেন। এই সময়টা দু' বছরের জায়গায় পাঁচ বছর হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু তাহলে তো রক্সি মহাবিপদে পড়ে যাবে। বহুদিন পরিশ্রম না করায় শরীরটা তার আর কষ্ট করতে পারে না। ঠেকে-ঠুকে বড়জোর দু'চার মাস দাসীর কাজ করতে পারবে। কিন্তু ছ'মাস বা এক বছর অসম্ভব। নির্ঘাত মারা পড়বে সে।

এতক্ষণ নানা ধরনের চিন্তায় মগ্ন হয়ে ছিল রক্সি। হঠাৎ একটা ধক্কা লাগায় বর্তমানে ফিরে এল। বাঁশী বাজিয়ে ছেড়ে দিল স্টীমার। টমকে একবার দেখার আশায় ডাঙার দিকে তাড়াতাড়ি একবার মুখ তুলে তাকাল রক্সি। ইচ্ছা শেষবারের মত তাকে তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেওয়া।

আশ্চর্য! আশেপাশে কোথাও টমের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। অদ্ভুত ব্যাপার তো! বিদায় কালে একবার মাকে দেখার চেষ্টা করল না সে? এই তার ছেলে! এই ছেলের জন্যেই রক্সি নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রক্সির কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। টমের উপর তার যে বিশ্বাস ছিল তা এক মুহূর্তে ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

নিউ কেন্টাকিতে যাওয়ার জন্যে স্টীমারের একটু কোনাকুনি পথ ধরতে হবে। কিন্তু একি! এ তো পুরো সমকোণে ঘুরে যাচ্ছে। এর অর্থ কি?

এক অজানা আশঙ্কায় রক্সির মনটা দুলে উঠল। স্টীমার কি সত্যি কেন্টাকিতে যাবে? সন্দেহ দেখা দিল রক্সির মনে। এতক্ষণ অন্য ধ্যানে মগ্ন থাকায় সে খেয়াল করেনি। স্টীমারটা খুব বড় হলেও সেই তুলনায় লোক সংখ্যা খুব কম। রক্সি জানে পারাপারের স্টীমারে লোকে ঠাসা থাকে।

বিভিন্ন লাইনের স্টীমার সম্পর্কে ভাল ধারণা আছে রক্সির। কারণ সে আট বছর জাহাজ কোম্পানিতে চাকরি করেছে। এত বড় স্টীমার যে পারাপারের কাজে ব্যবহার হয় না, সেটা তার অজানা নয়। তবে কি এটা ভাটি এলাকার স্টীমার? হ্যাঁ, ঠিক তাই! নিজের মাকে টম ভাটিতে বেচে দিয়েছে! বেঈমানি করেছে সে তার মায়ের সঙ্গে। সবকিছু জেনে শুনে টম তাকে দক্ষিণের আবাদে বেচে দিল? নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো তার। ভূমিষ্ঠ হবার পর টমকে বাঁচিয়ে রাখাটাই তার মস্ত ভুল হয়ে গেছে।

নিশ্চিত হয়ে জানা দরকার স্টীমারটা কোথায় যাচ্ছে। এই রকম একটা সন্দেহ নিয়ে বসে থাকা যায় না। কিন্তু সে তো লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। তাহলে জানার উপায়?

তার পাশে একটা ছেলেকে দেখতে পেল রক্সি। তাকেও শিকল ও আংটায় আটকে রাখা হয়েছে। চোদ্দ কি পনেরো বছর বয়স হবে তার। কিন্তু বয়সের তুলনায় ছেলেটাকে বেশি স্বাস্থ্যবান মনে হলো। পুরাপুরি নিগ্রো না হলেও, রক্সির চেয়ে অনেক কালো ছেলেটা।

দাস-দাসীদের মধ্যে একটি আঞ্চলিক ইংরেজি ভাষা চালু

আছে, যা একমাত্র ক্রীতদাসরাই বুঝতে পারে, অন্য কেউ বোঝে না। রক্সি ছেলেটাকে বলল, 'এই খোকা, বলতে পারো আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আমি খোকা? কে বলল তোমায়?' রেগে গেল ছেলেটা।

'না-না, খোকা কেন হবে! আমি তো তোমায় আদর করে ডাকছিলাম। জোয়ান, পালোয়ান তুমি। কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা তো বলবে?'

'আমি আলবামাতে যাচ্ছি, তুলোর আবাদে।' ওই যে, গুণ্ডার মত লোকটা, সেই আমায় কিনেছে।'

রক্সি তাকিয়ে দেখল, ওনিলের কথাই বলছে ছেলেটা। হায় কপাল! রক্সিকে তাহলে সে-ই আলবামায় যেতে হবে। সে তো অনেক দূর! ভাটি এলাকার একেবারে শেষ প্রান্তে। জাহাজ কোম্পানিতে কাজ করার সময় তাদের স্টীমার আলবামাতে আসা-যাওয়া করত। যাওয়ার সময় ডসন ল্যান্ডিং থেকে দেড়দিন সময় লাগে, কিন্তু ফেরার সময় স্রোতের উজানে আসতে হয় বলে আড়াই দিনের মত লাগে।

আর বিশ্বাসঘাতক টম তাকে বলল কিনা দশ মিনিটের রাস্তাও না। অথচ রক্সিকে নিউ কেন্টাকিতে যেতে হবে। দাঁতে দাঁত চাপল সে। এবার যদি সে মুক্তি পায় টমকে দেখে নেবে।

কিন্তু টম যদি সাহায্য না করে তাহলে মুক্তি পাওয়ার আশা করাই ভুল। নিজের ইচ্ছায় রক্সি দাসী হয়েছে, কিন্তু নিজের চেষ্টায় সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায়ই তো আর দেখা যাচ্ছে না। রক্সির পাশে ছেলেটির নাম হপকিন্স। ছোট করে হাপ্‌কি বলে

ডাকা হয়। বেশ মনখোলা ছেলে। মনের দুঃখ ভোলার জন্যে রক্সি ছেলেটার সাথে গল্প জুড়ে দিল। প্রথমেই নিজের সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা মেশানো একটা ধারণা দিল তাকে। তার মনিবের নাকি হঠাৎ আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, ফলে তাকে বেচে দিতে বাধ্য হন। তিনি অবশ্য কথা দিয়েছেন, অবস্থা ভাল হলেই ওকে আবার ফিরিয়ে আনবেন।

'ফিরিয়ে আনবেন? অসম্ভব! যে সব মনিবের চক্ষু লজ্জা আছে তারা ওই রকম বলেই থাকে,' মহাজ্ঞানীর মত বলল হাপ্‌কি। 'তুমি বিদায় হয়েছ, সে-ও তোমাকে ভুলে গেছে। এ-ব্যাপারে তুমি আমার সাথে বাজি ধরতে পারো।'

হাপ্‌কি রক্সির মনের কথাই বলল। শুনে রক্সি মুষড়ে পড়লেও, পরাজয় মেনে নিতে রাজি নয়। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের বাজি?'

'বাজি হলো, তোমার ওই পুরানো মনিব তোমাকে কোনদিন নিতে আসবে না। যদি দু'বছরের মধ্যে সে ফিরে আসে তাহলে তুমি আমার কান কেটে ফেলো। আর যদি না আসে তাহলে...তাহলে...আমি তোমার কান কাটতে পারব না। কারণ মেয়ে-ছেলের গায়ে হাত দেওয়া আমার স্বভাবে নেই।'

রক্সি হতভম্ব। একজন ক্রীতদাসের মুখে এত সুন্দর মন্তব্য আশা করেনি সে। 'আমি রাজি,' বলল রক্সি। 'ইচ্ছে করলে তুমি আমার কান কেটে নিতে পারো। কান কাটতে না চাইলে আমাকে বাঁদীর মত খাটিয়েও নিতে পারো। তুমি আমার একজন নতুন মনিব হবে!' হাসল রক্সি।

অন্য কিছু নয়, হাপ্‌কির সাথে কথা বলায় নিজে দুঃখ, কষ্ট, গ্লানি, কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ভুলে থাকল রক্সি। আলাবামার নদীরতীর থেকে আগের মত শিকল পরা অবস্থাতেই হাঁটা ধরল ওরা। অনেক দূরের পথ। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। জঙ্গলটাও খুব নির্জন। পথটা খুব সরু। রক্সি ও হাপ্‌কি আগে আগে চলছে। ঘোড়ার উপর বসে ওদের অনুসরণ করছে ওনিল। অকারণেই মাঝে মাঝে সে তার লম্বা চামড়ার চাবুকটা মাথার উপর সাঁই সাঁই করে ঘোরাচ্ছে।

ওনিল নিজে খুব তেজী একটা ঘোড়ায় চড়লেও, তাতে কোন লাভ হয়নি। কারণ রক্সি ও হাপ্‌কি পায়ে হেঁটে চলছে বলে তাকেও বাধ্য হয়ে আস্তে চলতে হচ্ছে।

অবশেষে সন্ধে পার করে ওনিলের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাল তারা। বিশাল চওড়া মাঠ, পুরোটাতেই তুলোর চাষ করা হয়েছে।

রাতটা বিশ্রাম নেওয়া দরকার। শক্ত গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে খোঁয়াড়। তার ভেতর রয়েছে দাস-দাসীর ঘর। ঘরগুলো গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো হয়েছে। এক একটা দাস পরিবার একটি নির্দিষ্ট কামরায় থাকবে। কিছুক্ষণ পর দাস-দাসীদের নিজেদের কামরায় ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল ওনিল।

ওনিল চলে যাওয়ার আগে গুণ্ডা কিসিমের এক লোককে এদের দেখা শোনার দায়িত্ব দিয়ে গেল। লোকটার নাম গুস্তেভ। তার চেহারার মধ্যে একটা একগুয়ে ভাব স্পষ্ট। লোকটা কথা বললেই তার এক পাটি দাঁত দেখা যায়। সেগুলো আবার কুকুরের

দাঁতের চেয়েও নোংরা ও হলুদ।

হাপ্‌কিকে ঢোকানো হলো পুরুষমহলে, আর রক্সিকে মেয়েমহলে। আলাদা হবার পর রক্সির মন খারাপ হয়ে গেল। তার শুধু বারবার হাপ্‌কির কথা মনে পড়ছে। বিচ্ছিন্ন হবার সময় হাপ্‌কি বলেছে, 'তোমার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে–আমি তোমার উপর খেয়াল রাখব, তুমিও আমার উপর খেয়াল রাখবে। আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে এমন লোক এখানে নেই।'

পরদিন সকাল থেকে শুরু হলো কাজ। গুস্তেভ প্রত্যেক খুপরির তালা খুলে দিয়ে গেল।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই রক্সি ক্রীতদাসী। দাসী হওয়া সত্ত্বেও এত সকালে তাকে কোনদিনই উঠতে হয়নি। দ্রিস্কলের বাড়িতে থাকার সময় রোদ উঠার আগে সে বিছানা ছেড়ে উঠত না। তারপর যে আট বছর স্বাধীন ছিল, তখন তো রানীর মত সময় কাটিয়েছে। জাহাজে চাকরি করার সময় একটা নিয়ম বেঁধে জীবন-যাপন করতে হত রক্সিকে। কিন্তু যখন চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ডসন শহরে ফিরে এল–তখন তার আয় না থাকলেও টমের সহায়তায় দ্রিস্কলের কাছে ভাল খাতির পেয়েছিল রক্সি।

কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আজ অসম্ভব শীতে ঘর থেকে বের হতে হলো রক্সিকে। লাইন ধরে দাঁড়িয়ে সবাই। বারান্দার পাশেই বাঁদীদের লাইন। গুস্তেভ এসে গুনে গেল। মোট চব্বিশ জন।

নাস্তা এল কালো কাফি আর একটুকরো আধ-পোড়া মাংস। মাংস ভেড়ার না শুয়োরের, তা জানার উপায় নেই। যে-সব দাস-

দাসী কাজে ফাঁকি দেয়, শাস্তি হিসাবে তাদেরকে দিয়েই এই খাবার তৈরি করানো হয়। সেজন্যে আরও একঘণ্টা আগে তাদেরকে বিছানা ছাড়তে হয়েছে।

কোন আলোর ব্যবস্থা নেই। তাই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কফি আর কাবাব খেলো সবাই। এত নিকৃষ্ট খাবার রক্সি কোনদিন খায়নি। কাবাবটাতে দু'এক কামড় বসাতেই তার বমি এসে গেল। কোন মতে কফিটুকু খেয়ে বমি আটকাল রক্সি। একে তো অতিরিক্ত গরম, তার ওপর তাড়াতাড়ি খাওয়ার ফলে কফির স্বাদ-গন্ধ কিছুই পেল না সে।

খাওয়া শেষে লাইন ধরে সবাই খোঁয়াড় থেকে বের হলো। খোঁয়াড়ের বাইরে এক পাশে আগুন জ্বলছে–গুস্তেভের হাত-পা সেঁকবার জন্যে। ওখানেই দাস-দাসীদের হাতে কাজ করার জন্যে যন্ত্র দেওয়া হলো। কেউ পেল মাটি কোপানোর জন্য কোদাল, কেউ পেল মাটি আঁচড়াবার বিদে, কারও পিঠে দেওয়া হলো ঝুড়ি–তুলো ভরার জন্যে। তারপর গুস্তেভের পিছু পিছু সবাই দল বেঁধে চলল।

ভোরের আলো ফোটার আগেই ওরা মাঠে এসে কাজ শুরু করল। হাপ্‌কি মাটি কাটার কাজ পেয়েছে। রক্সি তুলো সংগ্রহ করবে। এক মানুষ সমান উঁচু গাছের ডালে গোল গোল শুঁটি ধরে আছে। যেগুলো ইতিমধ্যে ফেটেছে, বাইরে থেকে ভিতরের তুলো দেখা যায়, শুধু মাত্র সেগুলোই তুলতে হবে। আগে এই কাজ না করায় বুঝতে বেশ সময় লাগল রক্সির। যে শুঁটিগুলো তোলার কথা, রক্সি হয়তো তা না তুলে অন্যগুলো তুলছে।

রক্সি খুব সাবধানে ধীরে ধীরে কাজ করতে লাগল, যাতে ভুল

না হয়। হঠাৎ শপাং করে রক্সির পিঠে চাবুক পড়ল। চমকে উঠে পিছনে তাকাল রক্সি। রেগে কাই হয়ে গেল সে। সে যে ভাটি এলাকার সামান্য একজন দাসী সে-কথা মনে থাকল না। রাগের সাথে গুস্তেভকে বলল, 'মারলে কেন আমায়?'

গুস্তেভ হতভম্ব হয়ে গেল। সে কি ভুল শুনল! মার খেয়ে ক্রীতদাসীর কৈফিয়ত চাওয়ার মত ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেনি।

'তবে রে বজ্জাত বাঁদী!' বলে মারার জন্যে আবার চাবুক তুলল গুস্তেভ। এবার ঠিক মুখের উপর চাবুক পড়ল। চামড়া কেটে একটা চিকন রক্তের স্রোত বেরিয়ে এল। বিশ্রী সব গাল দিতে দিতে গুস্তেভ আবারও চাবুক তুলল।

এমন সময় অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল। হাপ্‌কি দৌড়ে এসে গুস্তেভের হাত ধরে তাকে থামাবার চেষ্টা করছে।

চারদিকে হুলস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। গুস্তেভকে সাহায্য করার জন্যে দাস-দাসীরা ছুটে এল। সবাই মিলে রক্সি আর হাপ্‌কিনকে মারতে লাগল। একসময় ওদের দু'জনের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিল ওনিল। এটা পরেই ওদেরকে কাজ করতে হবে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।

দুপুরে খেতে না পাওয়ায় হাপ্‌কির তেমন কষ্ট হলো না। কারণ ভোরবেলা সে ওই পোড়া মাংসটা খেয়েছিল। কিন্তু রক্সি? সে তো ওই মাংস মুখেই তুলতে পরেনি।

বেড়ি পরা অবস্থায় তাড়াতাড়ি কাজ করা সম্ভব নয়। সেই জন্যে পরদিনই ওনিল ওদের বেড়ি খুলে দিল। কাজের এক ফাঁকে হাপ্‌কি রক্সির খুব কাছে চলে এল। তাড়াতাড়ি একটা রুটি রক্সির

হাতে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় চলে গেল সে।

বাবুর্চিদের পটিয়ে কাল রাতে এই রুটি চেয়ে রেখেছিল সে। ওই মাংস যে রক্সি খায়নি, হাপ্‌কি তা জানে। আজও যদি ওই পোড়া মাংস না খেতে পারে! সে-কথা ভেবেই তার এই রুটি নিয়ে আসা।

খেতে পারেওনি রক্সি। দু'দিন দু'মগ কফি ছাড়া কিছুই রক্সির পেটে পড়েনি। সে এতই দুর্বল হয়ে গেছে, কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এভাবে কাজ করতে না পারলে আবার চাবুক খেতে হবে।

আজ গুস্তেভ এই দিকে নেই। অন্য দিকে কাজ করছে! তার বদলে আজ এদিকে ওনিল ওদের উপর নজর রাখছে। গুস্তেভ অত্যন্ত বদমেজাজী, ওনিল তা জানে। কাজে ফাঁকি দিলে কিংবা বেয়াড়াপনা করলে দাস-দাসীদের মারতে হবে। কিন্তু বিশজন লোক যদি দুইজন লোককে মারতে থাকে তবে তো তারা মারা যেতে পারে। তাহলে তো উল্টে নিজেদের লোকসান হয়ে যাবে।

একটা কাজে একটু অন্যদিকে গিয়েছিল ওনিল। রক্সির পেট তখন খিদেতে ছিঁড়ে যাবার যোগাড়। ওনিল চলে যেতেই সে রুটিটা খেতে শুরু করল। সে যে কাজের সময় খাচ্ছে, সে-কথা মনেই থাকল না। খেতে খেতে রক্সি খেয়ালই করল না কখন ওনিল আবার ফিরে এসেছে। যখন দেখল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

রক্সিকে রুটি খেতে দেখে মারার জন্যে বাঘের মত ছুটে আসছে ওনিল।

গতকালের মারের কথা ভুলে যায়নি রক্সি। আজ আবার মার খেতে হবে! পা দুটোকে আর স্থির রাখতে পারল না সে। যেদিকে লোকজন নেই বললেই হয় খিঁচে দৌড় মারল সেদিকে। ওনিল ওর পিছু পিছু ছুটছে।

রক্সি অনেকটা এগিয়ে থাকার ফলে ওনিল খুব সহজে ওকে ধরতে পারবে না। তবু দৌড়াতে দৌড়াতে ওকে শাসাচ্ছে ওনিল–ধরতে পারলে চাবকে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে আনবে।

প্রাণপণে ছুটছে রক্সি। হঠাৎ সামনে একটা ঘোড়া দেখা গেল। রক্সি ভাবল–ও, আচ্ছা, এটা তো সেই ওনিলের ঘোড়া! এটায় চড়েই গোটা আবাদী এলাকা পাহারা দেয় সে। ঘোড়া পেয়ে আর কি রক্সি দেরি করে, এক লাফে সেটার পিঠে উঠে পড়ল। ঘোড়াও যেন তৈরি হয়ে ছিল, সওয়ার পেয়েই ঝড়ের বেগে ছুটল।

'ধর রে! ওই ধর! পালাল!' বহু লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

ঘোড়া ছুটছে। ঘোড়ার পিছনে ছুটছে মানুষ। আর ওদিকে গুস্তেভ তিনটে শিকারী কুকুরের বাঁধন খুলে দিচ্ছে।

ঘোড়া ছুটিয়ে বড় নদীর দিকে যাচ্ছে রক্সি। সে বরং পানিতে ডুবে মরবে, তবু ওদের হাতে ধরা দেবে না।

নয়

এটাকেও এক ধরনের শিকার অভিযান বলা যেতে পারে।

ইংরেজরা তো শিয়াল শিকার করতে ওস্তাদ। দশ-বিশটা এলাকার লর্ড আর ডিউকরা মহাসমারোহে কি শিকার করতে বেরোন? না, শিয়াল! শুনে যতই হাসি পাক, এর মধ্যে হাসির ছিটেফোঁটাও নেই; থাকলে আছে অসভ্যতা, বিকৃত রুচি আর চরম নির্মমতা। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আসেন তাঁরা, সঙ্গে থাকে প্রতি দলের সঙ্গে এক পাল করে শিকারী কুকুর। শিয়াল পালাচ্ছে, তার গন্ধ শুঁকে ধাওয়া করছে কুকুর, কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে ছুটছে ঘোড়সওয়ার। আজ অবশ্য শিয়ালের বদলে রক্সিকে ধাওয়া করা হচ্ছে। রক্সি রয়েছে ঘোড়ার পিঠে। কুকুরের দল যে-কোন মুহূর্তে রক্সির নাগাল পেয়ে যাবে। কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে অনুসরণ করছে ওনিলবাহিনী।

পা সম্বল করে তেজি ঘোড়ার নাগাল পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই একমাত্র ভরসা ওই তিন ডালকুত্তা। তবে কুকুরগুলোকে নিয়ে একটা ভয় আছে। নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলে ওগুলো শুধু যে রক্সিকে ছিঁড়ে খাবে তা নয়, ঘোড়াটাকেও জখম করবে, এমন

কি মেরে ফেলতেও পারে।

সব জেনেও কুকুরগুলোকে উৎসাহ দিচ্ছে ওনিল। রক্সি যদি পালাতে পারে, সেটা হবে খারাপ একটা দৃষ্টান্ত। তার সাফল্য দেখে রোজই একজন-দু'জন করে দাস-দাসীরা পালাতে শুরু করবে। পলায়ন তখন সংক্রামক একটা ব্যাধি হয়ে দেখা দেবে। চাষাবাদের কাজই করা যাবে না। বেচারা ওনিল কিছু দিনের মধ্যে নিঃস্ব হয়ে যাবে।

আসলে ঘোড়াটার সঙ্গে কুকুরগুলোর প্রতিযোগিতা হচ্ছে। এই জাতের ছোট কুকুর খুব জোরে ছুটতে পারে, ছুটন্ত একটা ঘোড়াকে ধরে ফেলা তাদের জন্যে অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম থেকেই রক্সির ঘোড়া বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে, অনেকটা সময় পার হয়ে যাবার পরও সেই দূরত্ব কমছে না। নদী আর বেশি দূরে নয়, একবার পানিতে নেমে যেতে পারলে কুকুরগুলোকে ফাঁকি দেয়া রক্সির জন্যে অনেক সহজ হয়ে যাবে। সে ভাবছে, পালাতে যদি না পারি, নদীতে ডুবে মরাও ভাল!

ওই তো সামনে বড় নদী, মহা-তরঙ্গিণী। কি কারণে কে জানে নদী আজ বড় অশান্ত। বড় বড় ঢেউ দিগন্তকে আড়াল করে রেখেছে। এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামল রক্সি। তারপর ছুটল।

নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হাতে কম্বলের তৈরি ভারী শার্ট আর কাঁচা চামড়ার বুট জোড়া খুলে ফেলল রক্সি। পিছন দিকে তাকাবার সাহস নেই তার, চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। কুকুরগুলো একেবারে কাছে চলে এসেছে। নদীতে পড়ে পানির

তলায় ডুব দিয়েছে রক্সি। পাড় ধরে খেপা কুকুরগুলো ছুটোছুটি করছে, গর্জন করছে অনবরত। রক্সি পানির তলায় থাকায় তার গন্ধ পাচ্ছে না ওগুলো। চোখেও দেখতে পাচ্ছে না। অসহায় আক্রোশে ছুটোছুটি আর হুঙ্কার ছাড়াই সার!

ডুব সাঁতার দিয়ে পাড় থেকে অনেকটা সরে এসেছে রক্সি। হাপ্‌কির দেয়া রুটির অবদান স্বীকার করতে হয়। ওই রুটিটা খেয়েছিল বলেই এখন সাঁতার কাটার শক্তি পাচ্ছে সে। অভুক্ত শরীর নিয়ে বড় নদীর সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে তাকে আজ আর বাঁচতে হত না।

ওনিল আর তার লোকজন তীরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে। তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করারও নেই তাদের। পানিতে নামবে? নেমে কি লাভ? ডাকাত মেয়েলোকটা ডুব-সাঁতার দিয়ে কোন দিকে সরে যাবে, তার কি কোন ঠিক আছে! নাহ্, এখন আর তাকে ধরার কোন উপায় নেই।

গোলামগুলোকে কাজ থেকে তুলে আনা হয়েছে, রীতিমত ছুটি উপভোগ করছে তারা। চারদিকে শুধু লোকসানই দিচ্ছে ওনিল। চোখ রাঙিয়ে অকারণে সবাইকে ধমক দিচ্ছে সে। তারপর গুস্তেভকে ডেকে বলল, 'বজ্জাতগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগাও। তারপর খোঁজ নাও কে রক্সিকে রুটি দিয়েছিল। আর, হ্যাঁ, আমার রাইফেলটা পাঠিয়ে দেবে। আমি এখান থেকে নড়ছি না।'

ওনিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ঘোড়ায় চড়ে নদীর কিনারা ধরে ভাটির দিকে যাবে সে, হাতে থাকবে রাইফেল। রক্সিকে একবার তো ডাঙায় উঠতেই হবে, তাই না? তখন গুলি করে তার ঠ্যাং

খোঁড়া করে দেবে সে। তারপরও যদি ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যায় মেয়েলোকটা, শহরে পৌঁছে তার নামে হুলিয়া বের করতে হবে তাকে।

পানির তলায় কতক্ষণই বা থাকা সম্ভব! ডুব সাঁতার দিয়ে ভাটির দিকে বেশ কিছু দূর এগিয়েছে রক্সি। গভীর পানিতে স্রোত বেশি, ভাবল তীরের কাছাকাছি থাকতে পারলে মন্দ হয় না। ঘুরে তীরের দিকে এগোল সে! কোন সমস্যা হলে আবার গভীর পানিতে ফিরে আসা যাবে।

ভাগ্যটা রক্সির খুবই ভাল। পানির তলা থেকে মাথা তুলতেই তীরে রশি দিয়ে বাঁধা একটা ডিঙ্গি নৌকো দেখতে পেল সে। আশপাশে নিশ্চয়ই কোন চাষীর বাড়ি আছে, সে সম্ভবত শখ করে মাছ ধরে, এই ডিঙ্গি তারই হবে। কোন রকম দ্বিধা না করে ডিঙ্গিটার কাছে চলে এল রক্সি, উঠে বসল তাতে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে অনেকটা দূরে ঘোড়ার পিঠে ওনিলকেও দেখতে পেল সে। তবে রক্সি যে ডিঙ্গিতে উঠছে, এটা ওনিলের চোখে ধরা পড়ল না।

ডিঙ্গি যখন পাওয়া গেছে, নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছাবার সিদ্ধান্ত নিল রক্সি। নদীটা পাড়ি দিলে তার নিরাপত্তা অনেকটাই নিশ্চিত হয়। একবারও সে ভেবে দেখল না যে নদী এখানে ত্রিশ মাইল চওড়া। মাঝনদীতে স্রোত এত প্রবল, ছোট একটা নৌকা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

সব দিক থেকেই ভাগ্যের সাহায্য পাচ্ছে রক্সি। নদীর ওপারে যাবার কোন প্রয়োজনই হলো না তার। নদী পেরুতে শুরু করে

মাইলখানেক মাত্র এগিয়েছে, এই সময় একটা বিরাট স্টীমার দেখতে পেল সে। এত বিপদের মধ্যেও আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করল তার। ঈশ্বর তাকে সাহায্য করছেন, কাজেই এ-যাত্রা বেঁচে যাবার আশা করা যায়। গায়ের ব্লাউজ খুলে বৈঠার মাথায় জড়াল সে, তারপর পতাকার মত দোলাতে লাগল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে ডিঙ্গি, কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই রক্সির। অবশেষে তার সঙ্কেতে কাজ হলো, স্টীমার থেকে ডিঙ্গিটাকে ওরা দেখতে পেয়েছে। উজানের দিকে যাচ্ছে, স্টীমারের গতি তাই মন্থর। রক্সি দেখল, স্টীমার থেকে একটা নৌকা নামানো হচ্ছে।

স্টীমারের নৌকা আসছে, রক্সির ডিঙ্গিও এগোচ্ছে। একটু পরই স্টীমারের গায়ে বড় বড় হরফে লেখাটা পড়তে পারল সে–'গ্র্যান্ড মুঘল'। আনন্দে আর উল্লাসে জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো রক্সির। ও, মেরি! ও, যীশু! এই গ্র্যান্ড মুঘলেই তো চাকরি করেছে সে! এই স্টীমারকে তো নিজের বাড়ি বললেই হয়! গ্র্যান্ড মুঘলের সব লোক তাকে খুব ভাল করে চেনে–ক্যাপটেন থেকে খানসামা পর্যন্ত সব্বাই! ঈশ্বর, সত্যি তুমি মহান!

দুই নৌকা এক হতেই পরিচয় পর্ব শুরু হলো।

'রক্সি! তুমি? কী আশ্চর্য! এখানে কি করছ তুমি?'

'জোনাথন! বাঁচাও, ভাই! আমাকে বাঁচাও! তুমি···মোসেল না? ভাইরে, কোন রকমে বেঁচে আছি এখনও! তোমরা না এলে এ-যাত্রা আর কোন আশা ছিল না। দানা আঙ্কেল, তুমিও দেখছি আছ! সে অনেক লম্বা কাহিনী, বাপ! সবই বলব। আগে বাঁচাও

আমাকে, স্টীমারে তোলো।'

গ্র্যান্ড মুঘলের ছোট-বড় সমস্ত কর্মচারী রক্সিকে বাঁচাতে পেরে আনন্দে আত্মহারা। রক্সির কাহিনী শুনে দুঃখে কাতরও হলো তারা। রক্সি তাদেরকে বলল, কয়েকজন শত্রুর ষড়যন্ত্রের ফলেই আজ তার এই দুরবস্থা। তারা তাকে দাসী হিসেবে ভাটি এলাকায় বিক্রি করে দিয়েছিল। প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে এসেছে সে, তবে ভাগ্যও তাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। ওরা শুধু ওকে একবার সেইন্ট লুইয়ে পৌঁছে দিক না, সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেবে সে।

এই গল্প গ্র্যান্ড মুঘলের লোকেরা পুরোপুরি বিশ্বাস করল। কারণ তারা সবাই জানে যে রক্সি স্বাধীন মহিলা ছিল। এই গ্র্যান্ড মুঘলে মুক্ত নারী হিসেবে দীর্ঘ কয়েক বছর চাকরিও করে গেছে সে। কেউ ষড়যন্ত্র না করলে মুক্ত-স্বাধীন একজন মহিলাকে ক্রীতদাসী হিসেবে বিক্রি হতে হবে কেন?

রক্সি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, ডসন ল্যান্ডিঙে ফিরবে না। কারণ তার ধারণা টমের এখন ডসনে না থাকারই বেশি সম্ভাবনা। মনে আছে, সে-ই টমকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিল, গায়কোয়াড়ের ছোরাটা বিক্রি করার জন্যে প্রথমে যেন সেইন্ট লুইয়ে যায়, সেখানে সুবিধে করতে না পারলে নিউ ইয়র্কে। তার পরামর্শ মত ছোকরা নিশ্চয়ই সেইন্ট লুইতে পৌঁছে গেছে। ওখানে তাকে যেতেই হবে, কারণ ডসন ল্যান্ডিঙে ওই ছোরা বিক্রি করা সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করলে নির্ঘাত তাকে জেলের ভাত খেতে হবে। কাজেই টম এত বড় বোকামি করবে না।

সেইন্ট লুইতে স্টীমার থেকে নেমে পড়ল রক্সি। বন্ধুত্বের খাতিরে ও শুভানুধ্যায়ী হিসেবে জাহাজের কর্মচারীরা চাঁদা তুলে বেশ কিছু টাকা ধরিয়ে দিল তার হাতে। না-না, এর কোন প্রয়োজন ছিল না, মুখে এ-ধরনের কথা বললেও, খুশি মনেই টাকাটা নিল রক্সি। হাত তো একেবারে খালি, টাকাটা পেয়ে তার খুব উপকার হলো। সেইন্ট লুইতে ঘোরাফেরা করতে হলে টাকা তো লাগবেই।

টম দ্রিঙ্কল সেইন্ট লুইতেই রয়েছে।

হোক জন্মদাত্রী, রক্সিকে মুক্ত করে আনবার কোন ইচ্ছাই তার নেই। জননীকে মুক্ত করে আনতে হলে অনেক টাকা লাগবে, অত টাকা খরচ করতে টমের মন বাধা দেবে। তারচেয়েও বড় একটা কারণে জননীকে ফিরিয়ে আনতে রাজি নয় সে। রক্সি মারাত্মক একটা গোপন তথ্য জানে। তার, টমের, আসল পরিচয়। আর কেউ জানে না, শুধু রক্সিই জানে। সে যদি ভাটি এলাকায় চিরকাল আটকা পড়ে থাকে, গোপন তথ্যটা ফাঁস হবার কোন ভয় নেই। তার মানে জননীকে ফিরিয়ে আনলে টম নিজের সর্বনাশ করবে। জেনেশুনে এত বড় বোকামি কিভাবে করে সে!

টমের এখন প্রচুর টাকা চাই। ডসন ল্যান্ডিঙে তার এত দেনা ছিল যে রক্সিকে বিক্রি করা টাকা দিয়েও তা পুরোপুরি শোধ করা সম্ভব হয়নি। বেশ কিছু লোক এখনও তার কাছে টাকা পাবে। নতুন নতুন দেনা হওয়াও তো থেমে নেই। দেনা হচ্ছেও, হবেও। জুয়ায় তো তাকে রোজই বসতে হচ্ছে, আর বসলেই হারছে সে।

কি একটা ছাই সময় যাচ্ছে, একদিনও জিততে পারছে না। কিন্তু নেশাটা মারাত্মক, জুয়ার টেবিল তাকে চৌম্বকের মত টানতে থাকে।

গায়কোয়াড়ের ছোরাটাই এখন টমের শেষ সম্বল। তবে ওটা বেচতে পারলে বেশ মোটা টাকা তার পকেটে আসবে। দেনা-টেনা শোধ করেও বেশ কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে জুয়ার টেবিলে বসা যাবে। রক্সির পরামর্শটা সে ভোলেনি। মূল্যবান হীরা-চুন্নি-পান্নার খদ্দের ডসন ল্যান্ডিঙে পাওয়া যাবে না। রক্সি সেজন্যেই তাকে বুদ্ধি দিয়েছিল সেইন্ট লুইয়ে বিক্রি করতে। নাহ্, একটা কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে– রক্সির মাথায় বুদ্ধি গিজগিজ করছে। এমন যার মা, সেই টম কেন বোকার মত কাজ করবে? সে বোকা হলে কি রক্সিকে ভাটি এলাকায় বিক্রি করার কথাটা মাথায় আসত?

ছোরাটা নিয়ে সেইন্ট লুইয়ে চলে এসেছে টম। না, এখনও কোন খদ্দের যোগাড় হয়নি। এ-সব কাজ তাড়াহুড়ো করে হয় না। আগে জানতে হবে চোরাই মাল কারা কেনা-বেচা করে।

একটা বিলাসবহুল হোটেলে উঠেছে টম। ঘটনাচক্রে ওই একই হোটেলে রক্সিও উঠল। হোটেলে ওঠার আগে ভদ্রগোছের বেশ কয়েক প্রস্থ কাপড়-চোপড় কিনেছে সে। আপাতত রক্সির টাকার কোন অভাব নেই, জাহাজ থেকে বেশ মোটা টাকাই পেয়েছে সে।

টমকে দেখে রক্সি যতটা খুশি হলো, রক্সিকে দেখে টম ঠিক ততটাই চমকে উঠল। তবে চমকটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না, তার বদলে বিরক্তিতে ছেয়ে গেল টমের মন। দক্ষিণের ভাটি এলাকা

থেকে রক্সি পালিয়ে আসতে পারবে, এটা সে কল্পনাও করেনি। তা-ও এত তাড়াতাড়ি! আর শুধু পালিয়ে আসেনি, হাজির হয়েছে সেইন্ট লুইয়ে! উঠেছেও একই হোটেলে। একসঙ্গে এতগুলো অবিশ্বাস্য ও কাকতালীয় ঘটনা ঘটলে কার না মেজাজ বিগড়ায়!

কিন্তু মেজাজ যতই গরম হোক, মুখে হাসি না ফুটিয়ে রেখে উপায় নেই। একমাত্র রক্সিই সেই গোপন তথ্যটা জানে। আবার যখন সে সভ্যজগতে ফিরে এসেছে, সেই আগের মতই রক্সির কথামত চলতে টম বাধ্য। রক্সিকে চটিয়ে কোন লাভ নেই। রক্সির হাতে তার মরণকাঠি রয়েছে না!

ভুল বুঝিয়ে ভাটি এলাকায় বিক্রি করার জন্যে টমকে খুব একচোট গালি দিল রক্সি। দেখা গেল এরই মধ্যে একটা ব্যাখ্যা তৈরি করে ফেলেছে টম। রক্সি থামতেই সে বলল, 'তুমি আমার মা, সব জেনেশুনে আমি তোমাকে ভাটি এলাকায় বিক্রি করতে পারি? তুমি একথা বিশ্বাস করতে পারলে? সব কথা শুনলে তোমার এই ভুল ধারণা ভেঙে যাবে। আসলে দায়ী ওই দালাল আর ওনিল। তারা আমাকে ঠকিয়েছে। বলল, 'নিউ কেন্টাকেতি নিয়ে যাবে তোমাকে, নদী পেরিয়ে দশ মাইলের মধ্যে। তুমিই বলো, আমি কি করে জানব ওরা তোমাকে ভাটি এলাকায় পাচার করে দেবে?'

তর্কটা টেনে লম্বা করা রক্সির ইচ্ছা নয়। সে জানে টম সত্যি কথা বলছে না। কিন্তু এখন তাকে খেপিয়ে কোন লাভ হবে না। ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছয়শো ডলার আদায় করতে হবে। ওনিলকে এই ছয়শো ডলার ফিরিয়ে না দিলে

সে আদালতে মামলা করতে পারে। নিজে যখন বিক্রি হলো, রক্সি কোন প্রতিবাদ বা আপত্তি করেনি। স্বাধীন মহিলা হওয়া সত্ত্বেও টমের যোগসাজসে সে যদি নিজেকে বিক্রি হতে দেয়, সেটা কি এক ধরনের প্রতারণা নয়?

অবশ্যই প্রতারণা। সত্যি যদি আদালতে মামলা হয়, টম ও রক্সি দু'জনেই ফেঁসে যাবে। জেল খাটা থেকে বাঁচার একটাই উপায়, ওনিলকে টাকাটা ফিরিয়ে দেয়া।

রক্সি জানে, ওনিল তার পিছু ছাড়বে না। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিকই সে স্নেইন্ট লুইয়ে পৌঁছে যাবে। আর যদি না-ই আসে, ভাটি এলাকায় বসেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করাতে পারবে সে। তখন রক্সি আর টমকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব চাপবে পুলিশের ওপর। পুলিশ আবার এ-ধরনের কাজে খুবই দক্ষ। দাস ব্যবসার আইনও অত্যন্ত কড়া।

কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, পারলে এখুনি, ছয়শো ডলার যোগাড় করতে হবে টমকে।

উত্তরে টম বলল, 'আমার কাছে তো কোন টাকাই নেই। ওনিলের কাছ থেকে পাওয়া টাকাটা তো দেনা শোধ করতেই বেরিয়ে গেছে। এখন পকেট একেবারে খালি।'

'ছোরাটা বিক্রি করছ না কেন?' জানতে চাইল রক্সি।

'চোরাই মাল, বিক্রি করা কি এত সহজ?' পাল্টা প্রশ্ন করল টম। 'ডসনে তো বিক্রি করা সম্ভবই ছিল না। এখানে আনার পরও বিক্রি করা যাচ্ছে না। কারণ সেই একই। পুলিশকে ছোরার বর্ণনা দিয়েছে লুইজি, ডসন ল্যান্ডিঙের পুলিশ সেইন্ট লুই আর নিউ

ইয়র্ক পুলিশকে তা জানিয়ে দিয়েছে। তার মানে, সেইন্ট লুই বা নিউ ইয়র্কেও ছোরাটা বিক্রি করতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

'তাহলে উপায়?' জিজ্ঞেস করল রক্সি, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল। 'তুমি কি চাও, ওনিল আমার নামে হুলিয়া জারি করুক, আবার আমি ভাটি এলাকায় ফিরে যাই?'

তাকে অভয় দিয়ে হাসল টম। 'চিন্তা করো না, উপায় একটা হবেই। ভাবছি, চুরি করাই ভাল। অনেকবারই তো করলাম, কই, একবারও তো ধরা পড়িনি! তোমার জন্যে নাহয় আরেকবার করলাম।'

তবে সেইন্ট লুইয়ে চুরি করায় সমস্যা আছে। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে তো লাভ নেই, এমন জায়গায় হানা দিতে হবে যেখানে প্রচুর পরিমাণে নগদ ডলার পাওয়া যাবে। আছে কিনা, তা-ও আগে থেকে জেনে নিতে হবে। সোনার কয়েকটা বোতাম বা একটা ঘড়িতে কাজ হবে না। ও-সব বেচে টাকা সংগ্রহ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। খুব বেশি টাকাও পাওয়া যাবে না। সব মিলিয়ে হাজার টাকা কামাতে হবে টমকে। ছয়শো দেবে ওনিলকে, রক্সিকে দেবে দুশো, নিজের জন্যে রাখবে দুশো।

'সেরকম জায়গা তুমি চেনো, হানা দিলে এক হাজার ডলার পাওয়া যাবে?' জানতে চাইল রক্সি।

'সেইন্ট লুইয়ে?' মাথা নাড়ল টম। 'নাহ্।'

'তাহলে?' হতাশায় ম্লান হয়ে গেল রক্সির চেহারা।

'সেইন্ট লুইয়ে নয়, ডসন ল্যান্ডিঙে এক লোক আছে, যার

বাড়িতে হানা দিলে হাজার ডলার বা তারও বেশি পাওয়া যাবে। কার কথা বলছি, বুঝতে পারছ না? আমার চাচাজান জজ ড্রিস্কল। কিন্তু সেখানে আমি কিভাবে চুরি করতে যাই বলো তো!'

'কেন? অসুবিধে কি? আমি তো মনে করি, এটাই সবচেয়ে নিরাপদ। জজসাহেবের টাকা তোমারও টাকা। চাইলে দেবে না, তাই গোপনে হাতিয়ে নেবে। নিরাপদ এই জন্যে যে, ধরা পড়লেও জজসাহেব পুলিশ ডাকবেন না।'

রক্সির তাগাদা, নিজের অভাব, এই দুই চাপে পড়ে চাচার সিন্দুক ভাঙতে রাজি হয়ে গেল টম। এক হাজার ডলার পেতে হলে সিন্দুকই ভাঙতে হবে। অত টাকা সিন্দুকের বাইরে রাখা হয় না। কিভাবে কি করতে হবে চিন্তা করতে লাগল টম।

জজসাহেবের একটা চাবি থাকে বালিশের তলায়। সেটা আলমিরার চাবি। আরেকটা চাবি পাওয়া যাবে আলমিরার ভেতর, সবচেয়ে নিচের দেরাজে। ওটা দিয়েই খুলতে হবে সিন্দুক। সিন্দুকে হাজার ডলারের কিছু বেশি বা কিছু কম থাকতে পারে। কখন কি প্রয়োজন হয়, এই পরিমাণ টাকাই বাড়িতে রাখেন জজসাহেব। বেশি টাকার দরকার হলে ব্যাংক থেকে তুলে আনেন।

সব রহস্যই জানা, এখন শুধু একটু কষ্ট করে টাকাটা বের করে আনা। অবাকই লাগছে টমের, টাকা সংগ্রহের এত সহজ উপায়টা এতদিন তার চোখে পড়েনি কেন? এর আগেও যেমন তার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে রক্সি, আজও বাঁচবার পথ বাতলে দিচ্ছে। মা বলে ডেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল সে। মন

যখন মায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে, তখনই শুধু রক্সিকে মা বলে ডাকে সে।

সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে যাবার পর মা-ছেলে ডসন ল্যান্ডিঙে ফিরে এল–টম এল প্রকাশ্যে, রক্সি গোপনে। যে মেয়েলোক মানুষ কেনা-বেচার হাটে দাসী হিসেবে বিক্রি হয়েছে, এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ্যে চলাফেরা করা তার উচিত নয়। কে না কে দেখে ফেলে, এই ভয় তো আছেই। তারচেয়ে বড় ভয়, ওনিল হয়তো ডসন ল্যান্ডিঙে এসে ওত পেতে অপেক্ষা করছে।

টম টাকাটা চুরি করতে পারলে ওনিলকে আর ভয় পাবার কোন দরকার হবে না। তার আগে পর্যন্ত রক্সিকে একটু সাবধানেই চলাফেরা করতে হবে।

ডসনে ফিরে এসে জজসাহেবের সঙ্গে দেখা করল টম। বন্ধুমহলেও তাকে দেখা গেল যথাসময়ে। জুয়ার টেবিল আবার তাকে টানল। গলায় মদ ঢালাও আগের মত শুরু হলো। পুরানো সব অভ্যাসই আবার ফিরে পেল সে।

ডসন ল্যান্ডিঙে ইতিমধ্যে মেয়র নির্বাচন হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে অল্‌ডারম্যান নির্বাচনের আয়োজন। মেয়র নির্বাচনে সবাই যা আশা করেছিল তাই ঘটেছে, বিপুল ভোটে জিতেছে উকিল উইলসন। শহরের লোকজন এখন আর গুবরে নামটা সজ্ঞানে উচ্চারণ করছে না। তবে অনেক দিনের অভ্যাস তো, ভুল করে মুখ ফস্কে বেরিয়ে আসে। তখন দাঁত দিয়ে জিভ না কেটে উপায় কি!

টম দ্রিস্কলের শত্রু লুইজি ক্যাপোলো অল্‌ডারম্যান পদে প্রার্থী

হয়েছে।

মদের দোকানে টমকে একদিন বলতে শোনা গেল, 'দিনে দিনে কতই না দেখব! খুনী-বদমাশদের তুলে এনে বড় বড় পদে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে!' বলেই চারদিকে ভয়ে ভয়ে তাকাল সে, দেখে নিচ্ছে আশপাশে ক্যাপোলোদের কেউ আছে কিনা। থাকলে নিশ্চয়ই ছুটে এসে আবার তার নিতম্বে লাথি কষবে। মাত্র পাঁচ ডলার জরিমানায় ওদের কি আর শিক্ষা হয়েছে! দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা এতই নগণ্য যে খুনীদেরকে বেশিদিন দমিয়ে রাখতে পারবে না।

গভীর রাতে বাড়ি ফিরল টম। এটাই তার নিয়ম। আরও কিছুক্ষণ পর চুপিচুপি তার ঘরে এসে একটা মেয়েলি পোশাক দিয়ে গেল রক্সি। চুরি করার জন্যে জজসাহেবের ঘরে ঢোকার সময় এই পোশাকটা পরে থাকবে টম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে যদি দেখেও ফেলেন, জজসাহেব তাকে চিনতে পারবেন না।

ছদ্মবেশ নিয়ে তৈরি হলো টম। গায়কোয়াড়ের ছোরাটা পকেটেই আছে। সাবধানের মার নেই, তাই অস্ত্রটা নিয়ে যাচ্ছে সে। একেবারে খালি হাতে বিপজ্জনক কাজে হাত দিতে নেই।

গোটা বাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে, শুধু হলঘরে মিটমিট করে একটা আলো জ্বলছে। কালো কাপড়ে আবৃত একটি নারীমূর্তি পা টিপে টিপে হলঘর পার হলো। দাঁড়াল জজসাহেবের ঘরের সামনে।

ঘরটার নিচেই রয়েছে ছোট্ট একটা বাগান, বাগানের পাশেই রাস্তা। টম হঠাৎ চমকে উঠল। কারা যেন কথা বলছে রাস্তায়। কি

মুশকিল! এত রাতে রাস্তায় লোক চলাচল করছে কেন? কান পেতে থাকল সে। তারপর আরেকবার চমকাল। অন্তত একটা কণ্ঠস্বর চিনতে তার ভুল হচ্ছে না। এ সেই লুইজি ক্যাপোলোর গলা! নিশ্চয়ই কোন পার্টি থেকে ফিরছে। ডসন ল্যান্ডিঙে তাদের বন্ধু-বান্ধব জুটেছে মেলা, প্রায়ই তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায়।

লুইজির কথা ভুলে নিজের কাজে মন দিল টম। একটু ঠেলতেই জজসাহেবের ঘরের দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে খাটের সামনে দাঁড়াল সে। ঝুঁকে হাত ঢোকাল বালিশের তলায়।

মন্দ কপাল! জজসাহেবের ঘুম ভেঙে গেল।

ছদ্মবেশ নিয়ে থাকলেও, চোখ মেলে সরাসরি টমের মুখটাই তিনি দেখতে পেলেন। আর দেখেই চিনে ফেললেন। টমও বুঝতে পারল যে চাচা তাকে চিনে ফেলেছেন। মুখোশ পরে না আসায় নিজেকে গাল দিল সে। ইতিমধ্যে বালিশের তলা থেকে চাবিটা বার করা হয়ে গেছে। সেই চাবিও জজসাহেব দেখলেন। কি ঘটছে, বুঝতে তাঁর এক সেকেন্ডও দেরি হলো না। চিৎকার করে বললেন, 'ছি, টম! তোমার এত অধপতন! তুমি চুরি করতে আমার ঘরে ঢুকেছ?'

রাগে টমের পিত্তি জ্বলে গেল। শালা বুড়ো, ধরে ফেলল তাকে! দাঁড়া তবে, মজা দেখাচ্ছি! পকেট থেকে গায়কোয়াড়ের ছোরাটা বের করেই ঘ্যাচ করে জজসাহেবের বুকে বসিয়ে দিল সে। 'শালা বুড়ো, ঘুম ভাঙার আর সময় পেলি না? অ্যাঁ, সময় পেলি না?'

আজ রাতে তৃতীয়বারের মত চমকে উঠল টম। নিচতলায় কারা যেন হৈ-চৈ করছে। জজসাহেব চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'তুমি চুরি করতে আমার ঘরে ঢুকছ?' তার সেই চিৎকার নিচে থেকে কোন দাস শুনতে পেয়েছে। শুনেই হাঁক ছাড়ছে সে, 'চোর! বাড়িতে চোর ঢুকেছে! কর্তার ঘরে চোর!'

দাস-দাসীরা ছুটে এল সিঁড়ির নিচে। টম ভাবছে, এখন সে পালায় কিভাবে? হলঘর হয়ে নিজের ঘরে ফেরা এখন আর সম্ভব নয়, সবাই দেখে ফেলবে। কাজেই তাড়াতাড়ি জানালা খুলে রাস্তায় নেমে এল সে। কয়েক পা এগিয়েছে, সামনের বাড়ির ক্লার্কসন পরিবারের কয়েকজন মহিলা জানতে চাইল, 'এই, তোমাদের বাড়িতে এত চেঁচামেচি কিসের? কি হয়েছে?' হৈ-চৈ শুনে এইমাত্র তারা নিজেদের জানালা খুলেছে।

জবাব না দিয়ে হঠাৎ ছুটতে শুরু করল টম। মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছে প্রতিবেশী মহিলাদের। তবে ধারণা করল, ওরা তাকে চিনতে পারেনি।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে তখনও গল্প করছিল ক্যাপোলোরা। চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজটা তাদের কানেও পৌঁছাল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল তারা। দাস-দাসীরা সবাই দোতলায়, জজসাহেবের ঘরে উঁকি দিচ্ছে। কি হয়েছে কেউ বলতে পারছে না। দেখার জন্যে ভেতরে ঢুকবে, সে সাহসও কারও নেই।

লুইজি আর অ্যাঞ্জেলো ঘরের ভেতর ঢুকল। খাটের ওপর রক্তাক্ত জজ ড্রিস্কলকে পড়ে থাকতে দেখেই চিৎকার করে উঠল তারা, 'জজসাহেব খুন হয়েছেন! জলদি পুলিশ ডাকো! মেয়রকেও

ডাকো!'

প্রথমে পৌঁছালেন মেয়র উইলসন, তারপর পুলিশ। পুলিশই জজসাহেবের বুক থেকে ছোরাটা টেনে বের করল। সেটা দেখে ভুরু কোঁচকালেন মেয়র উইলসন। বললেন, 'কাউন্ট ক্যাপোলো, আপনার না দামী পাথর বসানো একটা ছোরা চুরি হয়েছে? দেখুন তো, এটাই সেটা কিনা।'

ছোরার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে লুইজি বলল, 'হ্যাঁ, এটাই তো! কী আশ্চর্য!'

জজসাহেবের বুকে লুইজির ছোরা। অকুস্থলে লুইজি নিজেও উপস্থিত। পুলিশ কোন ব্যাখ্যাই শুনল না, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করল লুইজি আর অ্যাঞ্জেলোকে।

ছদ্মবেশ খুলে ফেলে দিয়েছে টম। পিছনের দরজা দিয়ে বাড়িতেও ঢুকেছে সে। নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছে নাক ডেকে। কে বলবে যে এই ঘুম তার অভিনয়!

দশ

মেয়র উইলসন লুইজির পরনের কাপড় ও হাত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু রক্তের কোন দাগ পাওয়া গেল না। তবু

জজসাহেবের বুকে তার ছোরা থাকায়, সে নিজেও অকুস্থলে হাজির থাকায়, পুলিশ তাকেই খুনী বলে সন্দেহ করছে। কিন্তু উদ্দেশ্য? জজসাহেবকে লুইজি কি কারণে খুন করতে যাবে?

কেন, সেই ডুয়েল?

ডুয়েলে জজসাহেবের কাছে তরুণ লুইজি হারেনি? পরাজয়ের সেই গ্লানি ভুলতে না পেরেই খুনটা করেছে সে। ইটালিয়ানরা যে চিরকালই প্রতিশোধপরায়ণ, এ-কথা কে না জানে! বেচারা লুইজি! তার পক্ষ নিয়ে কথা বলবার কেউ নেই। অ্যাঞ্জেলো তো ভাইয়ের পক্ষেই সাফাই গাইবে, কাজেই তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। লুইজি যে জজসাহেবকে লক্ষ্য করে গুলিই করেনি, সে-কথা ওরা দুই ভাই ছাড়া আর জানে সেই ডাক্তার। কিন্তু লুইজির এমনই কপাল যে ডাক্তার এখন ডসন ল্যান্ডিঙে নেই। তিনি কি একটা কাজে ইউরোপে চলে গেছেন।

মেয়র উইলসনও দ্বিধায় ভুগছেন। নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরও কর্তব্য লুইজিকে অপরাধী হিসেবে সন্দেহ করা। তবে তিনি শুধু মেয়র নন, একটি বিশেষ বিদ্যার ওপর তাঁর দখল আছে। হাতের ছাপ সংগ্রহ করেন ভদ্রলোক। কার হাতের কি বৈশিষ্ট্য তা তিনি একবার চোখ বুলিয়েই বলে দিতে পারেন। ছোরাটার ওপর কারও হাতের ছাপ আছে কি নেই, থাকলে কার হাতের ছাপ সেটা, এ-সব তিনি ঠিকই জানতে পারবেন। সেজন্যেই ছোরাটার হাতলের ফটো তুলিয়েছেন তিনি।

পুলিশী তদন্ত শুরু হলো। দুই কাউন্ট হাজতে বন্দী। তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারল, হত্যাকাণ্ড যখন ঘটে, ঠিক

তার পরই, রাস্তা দিয়ে একটা মেয়েকে ছুটে পালাতে দেখেছে ক্লার্কসন পরিবারের দু'জন মহিলা। মেয়েটিকে তারা জিজ্ঞেসও করেছিল, জজসাহেবের বাড়িতে কি হয়েছে। কিন্তু সে কোন উত্তর দেয়নি। ব্যাপারটা খুব রহস্যময়।

প্রশ্ন উঠল, কে ওই মেয়ে? খুনের সঙ্গে তার কি কোন সম্পর্ক আছে? সম্পর্ক না থাকলে ছুটে পালাবে কেন? সেই মেয়েটি যদি খুনী হয়, লুইজি তাহলে নির্দোষ। পুলিশ সমস্যায় পড়ে গেল। মেয়েটিকে যতক্ষণ না খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, লুইজিকে নিঃসন্দেহে খুনী বলে তারা ঘোষণা করতে পারছে না।

পরদিনই আদালতে হাজির করা হলো দুই ভাইকে। মেয়র উইলসন উপযাচক হয়ে ওদের পক্ষ সমর্থনের জন্যে দাঁড়ালেন। মহামান্য বিচারককে সম্বোধন করে তিনিও সেই কথা বললেন, 'সেই রহস্যময় মেয়েটিকে পুলিশ খুঁজে বের করুক। যতদিন তা না পারে, মামলা মুলতবি থাকুক।'

বিচারক যুক্তি-তর্ক শুনে মামলা মুলতবি করার পক্ষেই সায় দিলেন। পুলিশকে তাগাদা দিয়ে তিনি বললেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটিকে আদালতে হাজির করো।'

ছোরার হাতলের ফটোতে আঙুলের ছাপ পেয়েছেন মেয়র উইলসন। সেই ছাপের সঙ্গে ক্যাপোলোদের হাতের ছাপ মেলে কিনা পরীক্ষা করে দেখেছেন তিনি। না, কোন মিলই পাওয়া যায়নি। জজসাহেবকে ওরা দুই ভাই যে খুন করেনি, এ-ব্যাপারে মেয়র এখন পুরোপুরি নিশ্চিত। কিন্তু বিজ্ঞানের এই কেরামতি আদালত বিশ্বাস করবেন কিনা তা নিয়ে তাঁর মনে সংশয় আছে।

সেজন্যেই তিনি মেয়েটিকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

হাজতে প্রায়ই তিনি দুই ভাইকে দেখতে যান। সেজন্যে তারা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাদের দুঃখ হলো, এই বিপদের দিনে মেয়র উইলসন আর মিসেস কুপার ছাড়া আর কেউ দেখা করতে আসে না। অথচ দু'দিন আগেও কত বন্ধু ছিল তাদের। প্রমাণ ছাড়াই কি সবাই তাদেরকে অপরাধী বলে ধরে নিল?

সুযোগ বুঝে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে শহরে বিদ্বেষ আর ঘৃণা ছড়াচ্ছে টম। সত্য-মিথ্যা কত কথাই না রটাচ্ছে সে। লুইজি তো পুরানো পাপী, এর আগেও সে খুন করেছে। কেন, তার হাত দেখে মেয়র উইলসনই তো এ-কথা বলেছেন! আর কি চালাক ওরা! মিছিমিছি ছোরা হারাবার কথাটা রটিয়ে দিয়েছিল। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। আগে থেকেই প্ল্যান ছিল, ওই ছোরা দিয়ে জজ দ্রিস্কলকে খুন করবে। খুনের আগে ছোরা চুরি গেলে খুনের দায় যাতে চোরের ওপর বর্তায়। কিন্তু ঈশ্বরের মার বড় মার! এত চালাকিতেও কোন কাজ হয়নি। পুলিশ ঠিকই তাদেরকে গ্রেফতার করেছে।

টমের আবার সুদিন ফিরে এসেছে। জজ দ্রিস্কল মারা গেছেন, কাজেই উকিলরা তাঁর উইল খুলে পড়েছেন। তাতে লেখা আছে, জজ দ্রিস্কলের সমস্ত অর্থ-সম্পদ পার্সি দ্রিস্কলের একমাত্র বংশধর টম দ্রিস্কল পাবে। টম এখন রাজা বললেই হয়। টাকা ও সয়-সম্পত্তির কোন সীমা-পরিসীমা নেই তার।

রক্সির চাপে ওনিলের দেনা মিটিয়ে দিয়েছে টম। দালালের

মধ্যস্থতায় গোটা ব্যাপারটা মীমাংসা হয়ে গেছে। টাকা ফেরত পেয়ে মানুষ কেনা-বেচার হাট থেকে নতুন দাসী কিনে নিজের এলাকায় ফিরে গেছে ওনিল।

টমকে একটা প্রস্তাব দিল রক্সি। টাকা যাই লাগুক, সে যেন হাপ্‌কিকে কিনে নেয়। মাত্র দু'দিনের পরিচয়, তাতেই রক্সির জন্যে অনেক করেছে ছেলেটা। তার সাহায্য না পেলে ভাটি এলাকা থেকে রক্সি পালিয়ে আসতে পারত না। রক্সি নিজে পালিয়ে এল, অথচ ছেলেটা আজও সেখানে নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে, এটা মেনে নিতে পারছে না সে।

রক্সির কথায় প্রথমে রাজি হয়নি টম। কারও প্রতি দয়া দেখিয়ে টাকা খরচ করতে তার বয়েই গেছে! কিন্তু রক্সি এমন নাছোড়বান্দার মত ঘ্যানর ঘ্যানর করতে লাগল, বাধ্য হয়ে ওনিলকে প্রস্তাবটা দিতে হয়েছিল। রক্সির গরজ বুঝতে পেরে ওনিল দাম হাঁকল দ্বিগুণ। দাম শুনে পালিয়ে এল টম। অত টাকা খরচ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখল রক্সি। তার নিজের অবস্থায় টলমল করছে, কাজেই এখন হাপ্‌কিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ঠিক হবে না, এটুকু বোঝার বুদ্ধি তার এখনও আছে। টম যে-কোন মুহূর্তে তাকে আবার বিপদে ফেলে দিতে পারে। ছেলে তো নয়, পরম শত্রু। এই শত্রু আবার ইদানীং মানুষ খুনেও হাত পাকিয়েছে! কাজেই খুব সাবধানে থাকতে হবে তাকে।

মহাসুখে আছে টম। জুয়ার আসরই এখন তার ঘর-বাড়ি। খেলতে বসে ধার-দেনা করার প্রয়োজন নেই। হারার সঙ্গে সঙ্গে

যাঁর যা পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছে। জুয়ার আসরে টমের কদর বেড়ে গেল। মাথা নাড়লেন শুধু স্বর্গীয় জজ ড্রিস্কলের বন্ধু-বান্ধব আর উকিলরা। তারা বুঝলেন, জজ ড্রিস্কলের এত সাধের সয়-সম্পত্তি অসৎ পথেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

অল্‌ডারম্যান নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে। অন্যতম প্রার্থী লুইজি। মেয়র উইলসন সমর্থন দেয়ায় তার বিজয় সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু খুনের অভিযোগে যার বিচার চলছে, তাকে এখন কে আর ভোট দেবে?

কে যেন টমকে বুদ্ধি দিল, 'লুইজি তো বিদেশী, তার জেতারও কোন সম্ভাবনা নেই, তার জায়গায় তুমি দাঁড়াও! জজ ড্রিস্কলের কত নাম! তুমি তার ভাইপো, শুধু এই কারণে প্রচুর ভোট পাবে তুমি। আর যদি কোনভাবে গুবরে উইলসনের সমর্থন আদায় করতে পারো, তাহলে তো কেল্লাফতে! তোমাকে আর পায় কে!'

বাঁদরকে চাঁদ ধরার বুদ্ধি দিলে বাঁদর তো উৎসাহিত হবেই, তা না হলে সে বাঁদর কেন! প্রস্তাব শুনে নাচতে শুরু করল টম। শহরের লোক এতদিন তাকে অপদার্থ, অযোগ্য ইত্যাদি বলে গাল দিয়েছে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে। এখন যদি তাদেরই ভোটে অল্‌ডারম্যান হওয়া যায়, তারচেয়ে বড় কৃতিত্ব আর কি হতে পারে! ভোট? আরে, ভোট তো কিনতে হয়! টাকার লোভ কার না আছে! জজ ড্রিস্কল অনেক টাকা রেখে গেছেন, সেগুলোর সদ্ব্যবহার তো হওয়া চাই!

পরদিনই মেয়রের সঙ্গে দেখা করল টম।

প্রতিদিন সকালে মেয়রের কাজ হলো সংগ্রহ করা হাতের ছাপগুলো নিয়ে বসা। ছ'মাসের বাচ্চার ছাপ যেমন নিয়েছেন তিনি, সেই বাচ্চার ছাব্বিশ বছরের ছাপও তার সংগ্রহে আছে। শিশু থেকে যুবক, দীর্ঘ এত বছরের ব্যবধানে একজনের হাতের ছাপ কতটুকু বদলায় মিলিয়ে দেখেন তিনি। কিছু কিছু রেখা তো অবশ্যই বদলায়, আবার কিছু কিছু রেখা কোনদিনই বদলায় না। মেয়র তন্ময় হয়ে নিজের কাজ করছেন, এই সময় হাজির হলো টম।

টম মূর্খ হলেও, এটা ভালই বোঝে যে কারও কোন সাহায্য পেতে হলে তাকে খুশি করতে হয়। কে কিসে খুশি হয় সেটা ধরতে পারার মেধাও তার আছে। দোরগোড়া থেকেই সে দেখতে পেল উইলসন কি করছেন। 'ছাপ নিয়ে বসেছেন দেখছি! বেশ, বেশ। তা আরেকটা ছাপ নেবেন নাকি আমার? সেই ছোটবেলায় নিয়েছেন, তারপর তো নেননি আর।'

কিন্তু বেশি চালাকি করতে গেলে গলায় দড়ি পড়ে। কথাটা বলবার পর টম বুঝতে পারল কি মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছে সে। আগে নিজের জন্ম ও পরিচয় রহস্য জানা ছিল না, মাত্র কিছুদিন হলো জেনেছে। এ-ও শুনেছে যে হাতের ছাপ অনেক সময় জন্মরহস্য ফাঁস করে দেয়। সে যে ছাপ নিতে বলে ফেলল, তাতে যদি পরে কোন সমস্যা দেখা দেয়? কিন্তু ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন সেটা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

উইলসন বললেন, 'দাও হাতটা, নিই তোমার ছাপ। ঠিক কথা, অনেক দিন তোমার ছাপ নেয়া হয়নি। তোমরা তখন

একেবারে বাচ্চা ছেলে, সে কত বছর আগের কথা, দু'জনের ছাপ একসঙ্গে নিয়ে ছিলাম। দু'জন মানে, তোমার আর চেম্বারের–চেম্বার মানে, রক্সির ছেলে...'

কথা বলছেন উইলসন, তারই ফাঁকে কালির প্যাডটা টেনে নিয়ে একটা একটা করে টমের প্রতিটি আঙুলের ছাপ নিচ্ছেন কাগজে। সবশেষে তালুর ছাপও নিলেন।

তালুর ছাপ নেয়া হতেই টমের চোখ বিস্ফারিত–হয়ে উঠল। 'মেয়র সাহেব, একি আশ্চর্য কাণ্ড! এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত এই লম্বা দাগটা আবার কোত্থেকে এল? আমি তো আমার হাতে ওরকম কোন দাগ দেখছি না!'

উইলসনও বিস্মিত হয়েছেন, তবে একই কারণে নয়। নিজেকে তিনি তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন, 'এটা অবাক হবার কোন ব্যাপার নয়। এরকম রেখা হঠাৎ দেখা দিতে পারে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। আসলে ভাঁজ থেকে এগুলো তৈরি হয়। আমরা যখন রেখা বিশ্লেষণ করি তখন আঙুল বা তালুর ভাঁজ থেকে তৈরি দাগ এড়িয়ে যাই, বিশ্লেষণ করি শুধু স্থায়ী রেখা আর চক্রগুলোকে।'

'আপনি বলছেন, লম্বা এই দাগটা ভাঁজ থেকে তৈরি হয়েছে?'

'ভাঁজ থেকেই হয়েছে, এমন কথা বলি না। অন্য কারণও থাকতে পারে। যেমন, মাঝে মধ্যে চামড়ার ভেতর অতি সূক্ষ্ম ফাটল সৃষ্টি হয়, আবার তা মিলিয়েও যায়, খালি চোখে প্রায় সময় ধরাও পড়ে না–ধরা পড়ে ছাপে। তোমার এই দাগটাও হয়তো তাই।'

টম অল্ডারম্যান নির্বাচনে প্রার্থী হলে, মেয়র উইলসন কি তাকে সমর্থন করবেন? প্রশ্নটা শুনে উইলসনের কি প্রতিক্রিয়া হলো বলা মুশকিল। তিনি খুব তাড়াতাড়ি বললেন, 'আগে প্রার্থী হও তো, তারপর দেখা যাবে।'

আপাতত এতেই খুশি হলো টম। মেয়রকে রাজি করাতে হলে সময় লাগবে, এটা সে বোঝে। তাই আজ আর তাঁকে বিরক্ত না করে বিদায় নিল।

টম বিদায় হতেই তড়াক করে লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়লেন উইলসন। তাঁর সারা শরীরের রক্ত উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। আজ কয়েকদিন ধরেই একটা হাতের ছাপ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তিনি, সেই জজ দ্রিস্কল খুন হবার পর থেকে। সেই ছাপের সঙ্গে এই মাত্র নেয়া টমের হাতের ছাপ মেলাতে হবে। কারণ?

কারণ দুটো হাতের ছাপ হুবহু এক মনে হয়েছে তাঁর। তাঁর ধারণা যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ দুটো ছাপ যদি হুবহু মিলে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যাবে যে জজ দ্রিস্কলকে তার ভাইপো টম দ্রিস্কলই খুন করেছে।

যে হাতের ছাপটা গত কয়েকদিন ধরে বারবার দেখছেন উইলসন, সেটা লুইজির ছোরার হাতল থেকে তোলা হয়েছে, ফটোগ্রাফের মাধ্যমে। ওই ছোরা দিয়েই খুন করা হয়েছে জজ দ্রিস্কলকে।

উত্তেজনায় অধীর উইলসন দরজা বন্ধ করেই সেই ছাপটা বের করলেন। দুটো হাতের ছাপ পাশাপাশি রেখে মেলাতে বসলেন তিনি।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন উইলসন। দুটো ছাপ হুবহু এক। একটার সঙ্গে অন্যটার এতটুকু অমিল নেই। শিউরে উঠলেন তিনি। টম দ্রিস্কল তার চাচাকে খুন করেছে! ঈশ্বরের কি মহিমা, খুনী নিজেই যেচে পড়ে নিজের হাতের ছাপ দিতে এসেছিল! ভাইপো চাচাকে খুন করতে পারে, এই সন্দেহ উইলসনের মনে কখনোই জাগত না। টমের হাতের ছাপ নেয়ার কথা একবারও ভাবেননি তিনি, ভাবতেনও না। ঈশ্বর সে-কথা জানেন বলেই টমকে পাঠিয়েছেন! তেইশ বছর আগে নেয়া টমের হাতের ছাপ ও ছোরার বাঁটে পাওয়া ছাপের সঙ্গে মেলাবার কথা ভাবতেন না উইলসন। কিন্তু এখন ভাবছেন। ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন। দেখা যাক সেখানেও কোন রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা!

পুরানো ছাপ খুঁজে বের করা কোন কঠিন কাজ নয়, কারণ সবই একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ধরে সাজানো আছে। এই তো, পাওয়া গেছে। প্রথম ছাপটায় চোখ বোলালেন উইলসন। ছোট্ট শিশুর হাতের ছাপ, ছাপের নিচে নাম ও তারিখ লেখা–'টম দ্রিস্কল, পার্সি দ্রিস্কলের ছেলে'। নামের নিচে তারিখ লেখা হয়েছে তেইশ বছর আগের। এই খুদে হাতের ছাপ আর সদ্য তোলা বড় হাতের ছাপ অনেকাংশেই মিলে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জানা কথা, তাই মেলাবার কোন উৎসাহ বোধ করছেন না উইলসন। বলা যায় খেয়াল বশতই ছাপ দুটো পাশাপাশি রেখে অন্যমনস্কভাবে চোখ বোলালেন একবার।

ও ঈশ্বর! একি! কিছুই তো মিলছে না! এ আবার কি রহস্য? বিজ্ঞান কি তাহলে ভুল? দুটো ছাপের একটা রেখাও তো হুবহু

নয়!

হতভম্ব উইলসন মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। ব্যাপারটা তাঁর মাথায় ঢুকছে না। ছোট ছেলে বড় হয়, সেই সঙ্গে তার হাতের রেখাও কিছু কিছু বদলাতে থাকে। কিন্তু কিছু রেখা কোনদিন বদলায় না, একই রকম থেকে যায়। এ-ব্যাপারে এখনকার সব বিজ্ঞানীই একমত। কিন্তু এখানে তাহলে কি ঘটছে?

না, অসম্ভব! হাতের সব রেখা বদলে যেতে পারে না! হাত বদল সম্ভব, কিন্তু...

মনে মনে একটা হোঁচট খেলেন উইলসন। হাত বদল? তারমানে, মানুষ বদল?

উত্তেজনায় আরেকবার তড়াক করে চেয়ার ছাড়লেন উইলসন। এখন তার মনে পড়ছে। মানুষ বদলের সুযোগ তো ছিলই! নিজের ও গৃহকর্ত্রীর, দুই শিশুকে মানুষ করেছে রক্সি। বদল করার সুযোগটা কাজে লাগায়নি তো?

সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পার্সি ড্রিস্কলের বাড়িতে একই দিনে দুটি শিশুর জন্ম হয়েছিল। একটি শিশু পার্সি ড্রিস্কলের, দ্বিতীয়টি ক্রীতদাসী রক্সির। কাকতালীয়ভাবে, দুটি শিশুই দেখতে এক রকম হয়েছিল। সে সময়কার রক্সির একটা কথা আজও পরিষ্কার মনে পড়ে উইলসনের, "ওদেরকে গোসল করাবার সময় কোনটা যে কে তা আমার মনিবও চিনতে পারেন না"।

মারাত্মক একটা সন্দেহ অসুস্থ করে তুলছে উইলসনকে। কাঁপা হাতে শিশু চেম্বারের হাতের ছাপটা বের করলেন তিনি।

*

লুইজি ক্যাপোলোর মামলার পরবর্তী তারিখ পড়েছে সাতদিন পর। তারিখ পড়লেও, সেদিন শুনানি হবে না, কারণ সেই রহস্যময় মেয়েটিকে পুলিশ এখনও খুঁজে বের করতে পারেনি।

কিন্তু মেয়র উইলসন আদালতকে আগেই জানিয়ে দিলেন, শুনানি হবে, কারণ প্রমাণসহ খুনীকে চিহ্নিত করতে পারবেন তিনি। হয়তো নতুন তারিখ ফেলার দরকার হবে না, সেদিনই মামলার রায় হয়ে যেতে পারে।

বলাই বাহুল্য, নির্দিষ্ট দিনে ডসন ল্যান্ডিঙের ছেলে-বুড়ো সবাই আদালতে ভিড় করল। কি আশ্চর্য! এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে! পুলিশ খুনের আসামীকে ধরতে পারেনি, কিন্তু মেয়র উইলসন বলছেন তিনি তাকে ধরে আনবেন! এ হলো সেই উইলসন, সবাই যার নাম রেখেছিল গুবরে–"পুডনহেড"! কৌতূহল আর উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে সবাই। আদালতে আজ কি নাটকই না হবে!

এক নম্বর আসামী লুইজি ক্যাপোলো, হাজির। দু'নম্বর আসামী অ্যাঞ্জেলো ক্যাপোলো, হাজির। ওদিকে পুলিশ ও বিচারকও হাজির। আদালত কানায় কানায় পূর্ণ। সবার চোখের সামনে মেয়র উইলসন হাজির করলেন কালিমাখা একগাদা হাতের ছাপ।

দর্শকরা হয়তো হেসেই উঠত, কিন্তু মেয়রের গাম্ভীর্য দেখে সে সাহস কারও হলো না।

মেয়র সংক্ষেপে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন সর্বজনস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যটি। বয়েস বাড়লেও হাতের কিছু রেখা কোনদিনই

বদল হয় না, এবং একজন মানুষের হাতের ছাপ অন্য কোন মানুষের হাতের ছাপের সঙ্গে কখনোই মেলে না।

বোঝা গেল, আদালতে উপস্থিত সবারই কথাটা জানা।

এবার মেয়র দেখালেন, ক্যাপোলো ভাইদের হাতের ছাপ আর ছোরার হাতলে পাওয়া হাতের ছাপ এতটুকু মেলে না। অর্থাৎ এ থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে ওরা দু'জন খুনী হতে পারে না।

তারপর উইলসন বললেন, 'কিন্তু ছোরার হাতলে পাওয়া ছাপ অন্য এক লোকের হাতের ছাপের সঙ্গে মেলে। সেই হাতের ছাপ কার তা একটু পরই আমি বলছি। তার আগে আমি আদালতে দেখাতে চাই, সত্যি মেলে কিনা।'

নতুন একটা ছাপ হাজির করলেন উইলসন। সেটা কার তা তিনি এখনও বলেননি। বিচারক ও জুরিরা সেই ছাপের সঙ্গে ছোরার হাতলে পাওয়া ছাপ মিলিয়ে দেখলেন। সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, মেয়র উইলসনের দাবি সত্য–দুটো ছাপ হুবহু এক।

উইলসন বললেন, 'এবার আমি তার পরিচয় দিচ্ছি। যে ছাপটা মিলল, সেটা টম ড্রিস্কলের।'

আদালতে টমও হাজির। উইলসনের কথা শুনে কাঁপতে লাগল সে। তারপর দড়াম করে মেঝেতে আছাড় খেলো। পুলিস ছুটে এসে দেখল, টম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

উইলসন তখনও কথা বলছেন। অতি জঘন্য, অতি ভয়ঙ্কর একটি প্রতারণা; কুৎসিত, অন্যায় একটি ষড়যন্ত্র গত তেইশ বছর

ধরে এই ডসন ল্যান্ডিঙের বুকে চুপিসাড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্রিস্কল পরিবারের মর্যাদা, আভিজাত্য, প্রাচুর্য, স্নেহ-ভালবাসা ইত্যাদি অঢেল পরিমাণেই পেয়েছে একটি ছেলে–তার নাম টম। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাকে মানুষ বানানো যায়নি। এত কিছু পেয়েও দিনে দিনে আমরা তাকে অমানুষই হয়ে উঠতে দেখেছি। রহস্যটা কি? রহস্যটা হলো, টম আসলে দ্রিস্কলই নয়। টম যদি দ্রিস্কল না হয়, তাহলে কে সে? তার পরিচয়, সে ক্রীতদাসী রক্সির সন্তান। তার নাম চেম্বার।

তাহলে পার্সি দ্রিস্কলের সন্তান টম কোথায় গেল?

আছে সে। আছে দ্রিস্কল পরিবারেই। একজন ক্রীতদাস হয়ে। সবাই জানে, সে রক্সির ছেলে চেম্বার। কিন্তু আসল সত্য হলো, সেই ক্রীতদাসই টম দ্রিস্কল।

প্রমাণ? আছে বৈকি, অবশ্যই প্রমাণ আছে। তেইশ বছর আগে সংগ্রহ করা দুই শিশুর হাতের ছাপ আর টম ও চেম্বারের এখনকার হাতের ছাপ মিলিয়ে দেখলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আদালতের নির্দেশে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো রক্সিকে। উইলসন তাকে জেরা শুরু করলেন। সেই জেরার মুখে রক্সি বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। একবার নিজের অপরাধ স্বীকার করার পর গড় গড় করে সব কথাই খুলে বলল সে।

চেম্বারকে আদালতে হাজির করা হলো। ক্রীতদাস হিসেবে বড় হলেও, ছেলেটা অমানুষ হয়নি। আদালত তাঁকে দ্রিস্কল পরিবারের বৈধ সন্তান বলে স্বীকৃতি দিল। জজ দ্রিস্কলের সমস্ত সম্পত্তিও সে পাবে। টম দ্রিস্কল নামে পরিচিত রক্সির ছেলে চেম্বারকে হত্যার

অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করলেন বিচারক। রায় হলো, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। লুইজি আর অ্যাঞ্জেলো বেকসুর খালাস পেল। মেয়র উইলসনের সম্মানে মিছিল বের করল উল্লসিত জনতা, সেই মিছিল গোটা শহর প্রদক্ষিণ করছে।

আসল টম দ্রিস্কল যে সত্যিকার মানুষ হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। রক্সির ষড়যন্ত্রেই জন্মের পর থেকে তেইশ বছর ক্রীতদাস হয়ে জীবন কাটাতে হয়েছে তাকে, অথচ সেই রক্সিকে ক্ষমা করে দিল সে। শুধু কি তাই! হাপ্‌কি রক্সির উপকার করেছিল, এ-কথা শুনে হাপ্‌কিকে কিনে এনে মুক্ত করে দিল সে।

ক্ষমা পেয়ে কি করল রক্সি? সন্ন্যাসিনীদের এক মঠে আশ্রয় নিল সে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাকে।

***